http://www.elearninginfo.in

বিন্দু বিন্দু জল

শেখর দাশ

স্রোত প্রকাশনা

BINDU BINDU JAL
A Collection of Novel by Shekhar Das
প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৩, ধারাবাহিকভাবে দৈনিক সংবাদ, আগরতলা
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২০০৪, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ২০১৮, ক্রোড়পত্র, অমিতাভ সেনগুপ্ত, ঈশান, ইতিকথা
চতুর্থ প্রকাশ স্রোত সংস্করণ ঃ ২০১৯
© লেখক
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ বিকাশ সরকার
প্রচ্ছদ ছবি ঃ বিবেকানন্দ সরকার
যোগাযোগ ঃ হালাইমুড়া, কুমারঘাট ৭৯৯২৬৪, ঊনকোটি, ত্রিপুরা
মুদ্রণ : গ্রাফিপ্রিন্ট, হালাইমুড়া, কুমারঘাট ৭৯৯২৬৪, ঊনকোটি, ত্রিপুরা
প্রকাশক : সুমিতা পাল ধর
দূরভাষ : ৯৪৩৬১৬৭২৩১
পরিবেশক : অন্যপাঠ, কুমারঘাট, ত্রিপুরা
Visit us at : www.srot.co.in
email : srot_gobinda@rediffmail.com/boibari15@gamil.com
ISBN : 978-93-87715-74-5
মূল্য : ২০০ টাকা

কিছু কথা বাকি রয়ে যায়

'Being is Spontaneity'– Bakhtin

এক আনন্দ মুখর উপন্যাস লেখার অভিপ্রায় ছিলো। হয়নি লেখা। মগজে-মননে যখন, অহরহ বিঘ্ন ঘটায় বিঘ্নিত সব খবর --- শ্রীলঙ্কায় বিস্ফোরণের অমানবিকতা, নরকতূল্য সিরিয়ার স্থিতি, বিভিন্ন অস্ত্রধারীদের অন্যায় দাপট- চাদ, লিবিয়া, হণ্ডুরাস, কলোম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, লাতিন-আমেরিকা থেকে অনবরত নির্মম Libiya. exodus-influx এর প্রক্রিয়া; তখন মুখী শৌখিন গল্প গাথা নির্মাণের মানবিকতার অপমৃত্যু হয়।

আমার এই অপমৃত্যুই আমাকে লেখায়— 'বিন্দু বিন্দু জল'- এর মতো আখ্যান। 'কোষাগার, ' 'লস্ট হোরাইজন'- এর মতো ছোটগল্প।'

এমন পৃথিবী কোনদিন রচিত হবে, যেখানে ছিন্নমূলের প্রক্রিয়া চিরতরে স্তব্ধ হবে— এসবই ভাবায় আমাকে। আর কী?

'স্রোত প্রকাশনা'কে ধন্যবাদ। ঋণী থাকব উপন্যাসের পাঠকের কাছেও।

—শেখর দাশ

পৃথিবীর সকল ছিন্নমূল মানুষ-কে

কথাপৃষ্ঠা : এক

বিচিত্র এক কাকতালীয় কথা লিখি। কদিন ধরে মার্সেল প্রুস্ত এর 'In search of Lost Time' নামে মহা আখ্যান নিয়ে ভাবছি। কেননা এবছর ঐ মহা আখ্যানের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনার শতবর্ষপূর্ণ হল। আসলে চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে, নিমজ্জমান অস্তিত্বের যন্ত্রণা বুঝতে বুঝতে কেবলই তো সুপ্ত সময়ে ফিরে যেতে চায় মন। এই সূত্রে কীভাবে যেন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল শেখরের কথাবিশ্বের পুনর্বিবেচনা। তার ছোটগল্প বা উপন্যাস নিয়ে কিংবা নাটকীয়তায় গ্রথিত তার জীবন নিয়ে যখন ভাবি, লুপ্ত সময়ের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সহ যৌথ স্বপ্নের খিলান ও গম্বুজগুলি মনে পড়ে যায়। শেখরের কথা তো অনেক খানি আমাদেরও কথা যখন একক স্বর ছিল সমবায়ী সময়েরই স্বর। আমরা ছিলাম পরস্পরের কাছে অবিচ্ছেদ্য- সহজ এবং অকপট। তখন মুঠোফোনের মধ্য দিয়ে অতিসুলভ সংযোগের বিষক্রিয়া আমাদের চেতনাকে পঙ্গু ও স্বভাবভ্রষ্ট করেনি।

এবছর শতক্রতুর প্রস্তাবনা সংখ্যায় 'ক্রমশঃ তাপ' নামক ছোটগল্প প্রকাশিত হওয়ার ৪৫ বছর পূর্ণ হল। শেখরের সেই গল্প তখনকার শিলচরে ছিল পুরোপুরি অভাবনীয়। এর আগে প্রয়াত শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর 'অনিশ' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলি পড়ে আমরা বুঝতে শুরু করেছিলাম, এখানকার ছোটগ্রল্পে অতিদীর্ঘায়িত প্রাকআধুনিক পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী-উদয়ন ঘোষ- রণজিৎ দাশ -শান্তনু ঘোষদের কবিতায় ইতিমধ্যে নিশ্চিত আধুনিকতা শাণিত হয়ে গেছে। গদ্যে মিথিলেশ ভট্টাচার্য-অরিজিৎ চৌধুরী- রণবীর পুরকায়স্থরা ফুটি-ফুটি করছেন। ইতিমধ্যে কালান্তরের বার্তা নিয়ে ১৯৭৩ এর ২রা জুলাই এল শেখরের ক্রমশঃ তাপ ও মিথিলেশ ভট্টাচার্যের ছারপোকা। শুরু হলো বরাক উপত্যকার ছোটগল্পের ভুবনে শতক্রতুর পর্যায়। ক্রমশ তাপ বুঝিবা নতুন উদ্‌ভাসনের সিগনেচার টিউন। আজ মনে হচ্ছে, শেখরের অবচেতন থেকে সম্ভববত উঠে এসেছিল এই বার্তা ঃ ক্রমশ আরো উত্তাপ, আরো আলো ছড়িয়ে পড়বে গল্পকারদের সৃষ্টি নৈপুণ্যে। ১৯৭৩ থেকে অন্তত দুদশক ধরে হয়েও ছিল তাই। শেখর-মিথিলেশ-রণবীর-অরিজিৎ-বিজয় -আশুতোষ-কৃষ্ণ প্রমুখ গল্পকার নিজস্ব কক্ষপথে বিস্তর আলো ছড়িয়েছেন। দেবব্রত চৌধুরী, বদরুজ্জামান চৌধুরী, ঝুমুর পান্ডে, স্বপ্না ভট্টাচার্যদের সমবায়ী উপস্থিতিতে ঋদ্ধতর হয়েছে বরাক উপত্যকার

গল্পবিশ্ব।

তবে কোনো সন্দেহ নেই যে শেখর দাশ একক এবং অনন্য। এমনও বলা যেতে পারে যে বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশক মূলত শেখরের দশক। ঐ পর্বে সে একে একে লিখেছে 'আপৎকালীন', জোড়শালিখ', 'ফেরারি', 'মৃতবৎসা', 'শব্দের প্রতিচ্ছবি', 'ডায়নোসরের ফুসফুস', 'আজান' বা 'কোষাগার' এর মতো অবিস্মরণীয় কিছু গল্পকৃতি। বিশ্বায়নের প্লাবনে শিখর ও জলাভূমি একাকার না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের চেনা জগতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অচেনা জগৎ কে সে পুনরাবিষ্কার করেছে বিভিন্ন ছোটগল্পে। মধ্যবর্গিয়দের লক্ষ্যহীন ও বৃত্তবন্দী জীবন নিয়ে সে লেখেনি এমন নয়। যখনই তার সার্বক্ষণিক অভিনিবেশ পড়েছে ক্ষয়ক্লান্ত সমাজের নিচুতলার দিকে, রচিত হয়েছে দুর্ধর্ষ সব ছোট গল্প।

আরও একটি কথা না লিখলেই নয়। শুরু থেকেই শেখরের কলম যেন চলচ্চিত্রের ক্যামেরার মতো সক্রিয়। আমরা যারা তার লেখার হেঁশেলের খোঁজ-খবর রাখি, জানি যে চিত্রনাট্যের সূত্র ধরে বিভিন্ন শট কম্পোজিশনের মতো শেখর গল্প লেখে। ফলে সে হয়তো উপসংহার আগে লিখে নিল, তারপর কোনো একদিন লিখল মধ্যবর্তী কিছু সিকোয়েন্স। সব শেষে হয়তো বা লেখা হল গল্পের সূচনা। স্বভাবত খসড়ার শেষে তাকে চলচ্চিত্রের ধরনেই সম্পাদনা করতে হয় দীর্ঘ সময় ধরে। শব্দের প্রতিচ্ছবি ও ডায়নোসরের ফুসফুস গল্পদুটি এর সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত। 'জনসভা', 'আজান' ও 'কোষাগার' এর মতো উৎকৃষ্ট গল্পকৃতিগুলিতেও এই প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়।

দুই

একটা সময় এল এমন যখন ছোটগল্পের বদলে উপন্যাস সম্পর্কেই সে বেশি মনোযোগী। 'মোহনা', 'বানজারা' ও 'বিন্দু বিন্দু জল' ঔপন্যাসিক শেখরের সামর্থ্যের প্রমাণ দেয়। তবে শেষোক্ত উপন্যাসটি আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য যেখানে দেশভাগজনিত মানবিক বিপর্যয়ের কথা চমৎকার শিল্পভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। 'বিন্দু বিন্দু জল' যেহেতু পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে, পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন কীভাবে কাহিনির উপস্থাপনায় চলচ্চিত্রের শিল্পরীতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শেখরের কৃতিত্ব এখানেই যে দেশভাগের মূলে সক্রিয় ধর্মান্ধদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বাস্তবকে সে অস্বীকার করেনি, আবার মনুষ্যত্বগ্রাসী বিকারের ঐ আঁধিকে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বও দেয়নি। উন্মুল মানুষের যে ট্রাজেডি ইদানীং পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, তাকেই মুখ্য করে তুলেছে নির্মেদ আখ্যানে। সমাপ্তি বিহীন উপসংহারে যে বার্তা দিয়েছে শেখর তা অনবদ্য।

তবে এতে সংশয় নেই যে গল্পকার হিসেবেই শেখর বেশি লক্ষ্যণীয়। বরাক উপত্যকার আধা ঔপনিবেশিক পরিসরে ঘরে ঘরে যখন ক্লিষ্টতার ছবি, দারিদ্র্য-অনটন অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত সমাজ— শেখরের গল্পবিশ্বে কোনো ইচ্ছাপূরণের ছবি ফুটে ওঠেনি। তবে প্রাথমিক পর্যায়েও লক্ষ্য করি, বাস্তব পুনর্নির্মাণে শেখর প্রকল্পনার সাহায্য নিয়েছে। আর, কোনো ধরনের গল্প তৈরিতেই উৎসাহী নয় সে কেননা কাহিনি নির্মাতার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে চায় না। বরং সরাসরি জীবন থেকে কিছু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছবি তুলে আনতে চেয়েছে। এতে গ্রন্থনার পারম্পর্য থাকুক বা না থাকুক, এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই যেন। আপৎকালীন গল্পে পাঠক নতুন এক শেখর দাশের সন্ধান পেলেন যে বয়ানে সমকালীনতার স্পষ্ট কিছু চিহ্ন খোকাই করে যেতে চায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন হচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরবর্তী কোনো এক শহরে কীভাবে তার প্রচ্ছায়া পড়ছে— গল্পহীন গল্পকৃতিতে তৈরি হয়েছে সেই শিল্পিত প্রতিবেদন। আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির ক্ষয় ও রুগ্নতায়, শেখর যথার্থ লক্ষ্য করে, অহরহ ক্ষুধার কেনাবেচা চলছে। আসলে নিরন্ন মানুষ রোজ রোজ ক্ষুধা বন্ধক রেখে আসছে মহাজনের কাছে। কখনো রাতের অন্ধকারে, কখনো ভরদুপুরে নিঃস্ব হয়ে ফিরে যাচ্ছে কেউ কেউ, কোনোদিন সংসারে, কোনোদিন অন্য কোথাও'।

বস্তুত গল্পকার শেখর যত পরিণততর হয়েছে, স্মরণীয় বাচন তত সাবলীলী হয়ে উঠেছে তার গল্পকৃতিতে। এই নিরিখে তার গল্পভুবনে 'ফেরারি' আজও তুলনা-রহিত। আজও ভুলিনি গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পরে পাঠক মহলে অসামান্য আলোড়ন। গল্পকৃতি শুরু হয়েছে জীবনানন্দের বিখ্যাত একটি পঙ্‌ক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ঃ 'বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার'। আর ঠিক তারপরেই অনবদ্য বহুস্বরিক এই প্রারম্ভিক স্তবক ঃ 'এই শহরটা শহর নয়, ছাউনি। অস্থায়ী, একদিন সবকিছু গুটিয়ে ফেলবে ওরা, চলে যাবে অন্য কোথাও। শহর তখন হয়ে পড়বে তেপান্তরের মাঠ। মানুষ নিজের খেয়ালে বসত গড়ে ও ভেঙে ফেলে, যেভাবে নিয়তির খেয়ালে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় যত বিশ্বাস-স্বপ্ন-সম্পর্ক। জীবনের কোনো স্থিরতা নেই'।

আজ চুয়াল্লিশ বছর পরের এই পুনঃপাঠে, ২০১৮ সালের পড়ন্ত বেলায় ভাষিক আধিপত্যবাদ-তাড়িত বিপন্নশহর শিলচরের আক্রান্ত বাঙালিদের কথা ভেবে মনে হচ্ছে, এখনই বুঝিবা শেখরের উচ্চারণ বেশি প্রাসঙ্গিক। নিষ্ঠুর ইতিহাস তাড়িত ছিন্নমূল বাঙালিরা পূর্বে-পর্বান্তরে এই জনপদ গড়ে তুলেছিল। আর, দেশ ভাগের ৭২ বছর পরে দেখতে পাচ্ছি, শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার অপরাধে এবং ভাষা-বিদ্বেষীদের সর্বাত্মক চক্রান্তে জনপদের মানচিত্রটাই বুঝিবা পাল্টে যাবে। রাষ্ট্রহীন ভাসমান জনগোষ্ঠীর পক্ষে এ শহর ছাউনি হয়ে উঠবে, সমস্ত বিশ্বাস-স্বপ্ন-সম্পর্ক চুরমার অনেকটা অস্পষ্ট

হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার বোধ রয়ে গিয়েছিল অবচেতনায়। ৪৪ বছর পরে সৈকতের অনুভব দিয়ে সাম্প্রতিক পাঠককেও বুঝে নিতে হয় একটা ভাঙাচোরা শহরের আপৎকালীন চলাচল।

তিন

স্বপ্নদর্শী তরুণ সৈকত, তার নীলুদি কিংবা প্রথমদাকে নিয়ে যে গল্পহীন গল্পের বয়ান গড়ে উঠেছে, তার বিশিষ্ট উপস্থাপনাতেই গল্পত্ব। সার্থক ছোটগল্প হওয়ার জন্য কাহিনির প্রয়োজন যে খুব বেশি নয়, সত্তর দশকের গোড়ায় কার্যত অপ্রস্তুত পাঠক সমাজের কাছে শেখর এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। সেই দিনগুলিতে পড়ুয়ারা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন, 'বাদামী নিঃসঙ্গতা' বা 'রাতের ট্রেন বিদেশ ভালবাসে' জাতীয় অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে। কত নিবিষ্টভাবে সংলগ্ন নিসর্গকে লক্ষ্য করেছিল শেখর, তার চমৎকার প্রমাণ রয়েছে এই বাক্যগুলিতে ঃ 'দূরে ওৎ পেতে থাকে চতুর বেড়ালের মতো ঘাপটি মেরে বসে আছে শান্তনীল বড়াইল। চূড়াটা অদ্ভুত। ঠিক জোড়া স্তনের মতো। নীল স্তন। এমন পাহাড় বিশ্বব্যাপী খুঁজলেও মিলবে কীনা সন্দেহ'। এছাড়া, আগেই লিখেছি, গল্পকৃতি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে শেখরের চলচ্চিত্র সুলভ দৃষ্টিপাতের বিশেষ ধরন। আমরা যারা নিত্যদিন শিলচরে পথ চলি, শেখরের মতো কি ভাবতে পারি ঃ 'প্রাণ খোলা হাসির মতো ট্র্যাঙ্ক রোড'। আসলে সত্তর দশকের গোড়ায় সেই শুনশান পথ গত চার দশকে একটু একটু করে হারিয়ে গেছে। সেই জন্যে 'ফেরারি' পড়তে পড়তে সেদিনের কোনো পড়ুয়া হয়তো স্মৃতির ভুবনে খুঁজে নিতে চাইবেন 'বড়াইলের নীল আভা', 'বরাকের বুক ধোয়া স্বল্প কুয়াশা'। সৈকতের চোখ দিয়ে দেখতে চাইবেন 'অনেক দিনের অদেখা মেঘলা আকাশ, ধানের শিস দেওয়া পাখির ক্রীড়া, হু হু বাতাসের তাপাং বিল, বালুচর, এইসব'।

'ফেরারি' পড়তে পড়তে অনুভব করি, লুপ্ত সময়ে আমরা প্রত্যেকেই হয়তো সৈকতের মতো গল্পহীন গল্পের সূত্রধার ছিলাম। জীবন-জীবিকার অহরহ সংঘর্ষ সত্ত্বেও আমাদের স্বপ্ন ছিল, বিবিক্তি ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল হৃদয়ের অফুরাণ উষ্ণতা। সেই সময়ের তরুণ, অনুভবে টের পেত, 'কোনো কিছুই স্থায়ী নয় বিশেষ', তবু এই মানবিক উপলব্ধিও ছিল ঃ 'কে আছে ছিলচরে এমন আর। নিতান্ত সংসারের গুটি কয়েক অবসন্ন মানুষ ছাড়া। এরা কী দিয়েছে ওকে। কতটুকু দেবার শক্তি আছে ওদের। আছে, স্বীকার না করলে বিবেক দংশায়। এক শতচ্ছিন্ন নাভির মর্মমূল ছুঁয়ে জন্মেছে সবাই, ভাইবোন, নিঃশব্দ তুষারপাতের মতো বুকে জন্মে গেছে মায়া, টান। এরাই রক্তে গুজে দিয়েছে এক নিলিপ্ত নিমন্ত্রণ'। চুয়াল্লিশ বছর পরের এই পুনঃপাঠে মনে হয়, এমন বয়ানও

আসলে প্রুস্তীয় ঘরাণার 'Remembrance of things past!' 'র —অতীত আর কোনোদিন ফিরে আসবে না— আত্মবিনাশক সাম্প্রতিকে, তার প্রতিবেদন পড়তে পড়তে নিরাময়হীন স্মৃতিপীড়া অনুভব করি। বুঝতে চাই, সত্যিই কি প্রকৃতির কাছে মানুষের সম্পর্ক ভুল!' বহুবিধ উৎকেইন্দ্রকতায় আক্রান্ত বর্তমানে কোনো নীলুদি কোথাও নেই আর। নেই সৈকতের মতো কোনো ভবঘুরে পান্থজনও যে বিপুল সংলগ্নতাবোধ সত্ত্বেও নিঃসঙ্গ। আবার সে এও জানে ঃ 'প্রতিটি মানুষ আমৃত্যু সঙ্গ চায়, সহবাসে মানুষের কোনো ক্লান্তি নেই।... তবু আদিম নিঃসঙ্গতা কাটে না কিছুতেই। সংসারেই সন্ন্যাসীর ভিড় বেশি'।

এই উচ্চারণ কি কেন্দ্রহীন বিশ্বাসহীন এবং যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন আরোপিত আধুনিকোত্তরবাদের প্রচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন সাম্প্রতিকের পক্ষে দুর্বোধ্য গ্রিক নয়? আদিম শরীরী লিপ্ততার সুখ-অসুখ জনিত জটিলতার বয়ানে অভ্যস্ত হতে গিয়ে পাঠকের মন থেকে হারিয়ে গেছে অনাগরিক জীবনের সংকেত। তাই শেখরের 'ফেরারি' যে বার্তা দেয় তার তাৎপর্য এখন বুঝে নিতে হবে নতুনভাবে ঃ 'বিলের স্তব্ধ কুয়াশা দেখে যে কেউ দু'দন্ডের জন্যে ভাবলেও ভাবতে পারে— সংসারে মানুষ বড় একাকী। ... এইভাবে বহুবার বিকেল আসে আর চূর্ণ বিচূর্ণ হয় চেতনা, যে চেতনার নাম জীবন আর যাকে ঘিরে ঘিরে ক্রমশ স্মৃতি আর স্মৃতি। বুকের ভেতর বেশ কয়েকটা মেঘলা আকাশ, বর্ষণহীন'। একসময় প্রতিবেদন সমাপ্তি রেখায় পৌঁছায় কিন্তু তার অনুরন চলতেই থাকে। অন্তিম বাক্যটি হয়ে ওঠে বহুস্বরিক ঃ 'ঐ মোহনপুরের মাঠ পেরোলেই জোড়সালিখের দেখা মেলে'। অন্তঃস্বর খচিত বয়ান রচনা শেখরের নিজস্ব অভিজ্ঞান। শুধু গল্পহীন গল্পেই নয়, (যেমন 'শব্দের প্রতিচ্ছবি' বা 'ডায়নোসরের ফুসফুস') যে সমস্ত গল্পকৃতিতে কাহিনির সূত্রে বক্তব্যের ভার ও ধার স্পষ্ট, সেখানেও। 'মৃতবৎসা', 'আসন্ন বিকেলের শেষে', 'আজান' ও 'কোষাগার' এর মতো ছোটগল্প এর চমৎকার নিদর্শন। সময়ের প্রতিবেদন হিসেবে 'আজান' ও 'কোষাগার' উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গল্পবিশ্বেই অনন্য। বিশেষভাবে কোষাগার মানব বিশ্বের নিষ্করণ অবসানের বৃত্তান্ত হিসেবে পর্বে-পর্বান্তরে প্রাসঙ্গিক থাকবে বলেই মনে হয়।

চার

শেখরের গল্পকৃতি পুনঃপাঠ প্রসঙ্গে 'কোষাগার' নিয়ে ভাবতে ভাবতে মনে হল, এই গল্পকৃতিতে নিহিত ছিল শেখরের সম্ভাব্য ম্যাগনাম-ওপাসের বীজ। কিংবা বিচিত্র ও সূক্ষ্ম সংবেদনার সূত্রে যেন তার প্রতীকী আত্মবিক্ষণের কথকতাও। একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলে মনে হয়, শেখরের লেখক জীবনের প্রারম্ভিক থেকে পরিণত পর্যায় পর্যন্ত

ব্যাপ্ত রয়েছে ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য উপস্থিতি। কী আশ্চর্য সমাপতনে শেখরের ব্যক্তিগত জীবনেও সম্প্রসারিত হল সেই অনিবার্য বাস্তবতায় সম্পৃক্ত পরাপাঠ। নইলে দীর্ঘস্থায়ী পীড়ায় আজ কেন শেখর দাশ গৃহবন্দী?

কেনই বা পরিণতির পর্যায়ে হঠাৎই কালান্তক ব্যাধির রূপ নিয়ে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে মৃত্যুও তুলে নিয়ে যায় আত্মজাকে। আর ক্রমশ বিশ্ব সংসারের সঙ্গে সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে আসে তার। বছরের পর বছর চলে যায় মর্মবিদারী আঘাত সত্তার মধ্যে শুষে নিতে নিতে। কিন্তু অ-সুখ নানাবিধ পীড়া হয়ে ডালপালা বিস্তার করে। নিষ্ক্রমণের কোনো পথ খুঁজে পায়না সেই প্রখর সংবেদনশীল লেখক সত্ত্বা যে জীবনানন্দের কবিতায় অস্তিত্বের সংকট সম্পর্কে পাঠ নিয়েছিল। দেরিদার বিনির্মাণপন্থী প্রতিবেদনগুলির মূল নির্যাস খুঁজতে গিয়ে হলেন সিঘে যে 'Omnipotence otherness' এর কথা লিখেছিলেন, সেই অপরতার অতীভবে শেখরের সাহিত্য পরিসরও যেন বিপুল ভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেই পরিসরের মধ্যে সর্বজনীন (Public) ও ব্যক্তিগত (Private) অনুভবের টানাপোড়েন বিনির্মাণপন্থার যথার্থ আশ্রয় হতে পারে।

যাঁরা শেখর দাশ সম্পর্কে অগ্রাহী, তাঁদের জানাতে পারি, শয্যাশায়ী হয়েও সম্প্রতি সে দুটি প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার চিত্রনাট্যতুল্য গ্রন্থনা সম্পূর্ণ না হচ্ছে, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে আমাদের। যেহেতু কোনো না কোনো ভাবে তার সমস্ত রচনাই সম্বোধ্যমানতা সম্পর্কিত অন্তহীন নিরীক্ষা, পর্বে পর্বান্তরে সম্বোধিতেরাই সংযোগ-সামর্থ্য সম্পর্কে মন্তব্য করার অধিকারী। দেরিদার একটি চমৎকারা মন্তব্য দিয়ে এই বয়ানের আপাত-সামপ্তিতে পৌঁছাতে পারি ঃ 'Genius is not a subject, nor an imaginary subject, nor a subject for laws or for symbolism, a possible, subject, genius is what happens. Geniusness is the uniqueness of an impossible arrivingness to which one addresses oneself.' (Geneses of genealogis, Genres and Genius : Edinburgh University Press, 2006,78-79)

হ্যাঁ, শেখরও প্রমাণ করেছে ঃ 'Genius is what happens!'

— তপোধীর ভট্টাচার্য

কথাপৃষ্ঠা : দুই

তিন বাক্য ছয় শব্দে পৃথিবীর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প লিখিয়ের শিরোপা যার মাথায় চাপিয়ে সেওয়া হয়েছে সেই মহামতি কথাসাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'খুঁটিনানিট বর্ণনা গল্পকে মাননিবক করে আর গল্প যত মানবিক হয় ততই তো ভাল।' ঠিকই তো লেখা মানবিক না হলে যে লেখকের লভ্যাংশে পড়ে থাকে শূন্য। কবিতায় চিত্রশিল্পে ভাস্কর্যে স্যুররিয়্যাল সংকেতের জটিল ব্যবহার হতে পারে পরিসরের স্বল্পতা বিবেচনায়। তাই হয়তো কথাসাহিত্যের বর্ণনা সিনেমাশিল্পকে পথ করে দিয়েছিল শুরুর দিন থেকে। এই কারণেই কথাসাহিত্য এখনও প্রকাশমাধ্যমের শ্রেষ্ঠতম। বরাক উপত্যকার সাবালক কথাসাহিত্যের হয়ে ওঠার দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে বর্ণনার কথা উঠে এলো। কথাকে ছোটো করার ঘোর বিরোধী বরাক উপত্যকার বিগ্রহপ্রতিম কথাকার শেখর দাশ বলেছেন 'বনসাই কখনও শিল্প হতে পারে না, বামন করার অর্থ নির্মমতা, পরিহার করা উচিত।' শের শায়েরির দেশ লক্ষ্মৌ-এ জন্মে কথানির্মাতা শেখর দাশ শুরু থেকেই সিনেমার ভক্ত। সিনেমার ভাষায় কথাও বলে কাট ডিজলভ। কবিতা লেখে, উর্দু শের শুনিয়ে বন্ধুজনদের মেজাজ ফুরফুরে করে দেয়ে কখনও বা বিষণ্ণ। সিনেমার কারুকাজে রপ্ত হলেও ব্যয়বহুল চিত্রনির্মাতা হওয়া তখন সাতের দশকে কাছাড়ের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালির নাগালের বাইরেই ছিল। শিলচরে হাতের কাছে কিংবা ছোঁয়াছুঁয়ির কাছাকাছি নেই কোনও সিনেমা নির্মাতা, তাই হয়তো কথাশিল্পের ঘোলে দুধের স্বাদ মেটাতে নিভৃতে লিখতে শুরু করেন ভিন্ন ধারার ছোটোগল্প। লেখা তো হয় ছাপা আর হয় না, ফর্মাওয়ারি লেখা ছাপার ছাপাখানা কই, তবে সময় তখন অনুকূল, ছাপাখানার তালা খোলার চাবি নিয়ে যে হাজির তিন সম্পাদক শ্যামলেন্দু সত্তরে আর কয়েক বছর পর মিথিলেশ তপোধীর। শহরে গল্পওয়ালা বলতেও তখন দু'জন শ্যামলেন্দু মিথিলেশ, নতুনপট্টির মিথিলেশ বিপাকে পড়ে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসে মালুগ্মরাম থানার পাশে ভাড়াবাড়িতে। কাছাকাছির সঙ্গী তপোধীরের

সঙ্গে তখন অধুনালুপ্ত ঐতিহাসিক যুবাবুদ্ধির ঠেক ননীদার স্টলে চা ঘুগনি সিগারেট নেশাড়ু বেকারদের নিত্য আনাগোনা। 'কাফকা' নামের নির্ভুল পাসওয়ার্ডে বরাক নদীর পারের রিভারভিউ বাড়ির শেখর দাশেরও স্থায়ী অনুপ্রবেশ ঘটে তখন শতক্রুতু চক্রে। কারণ ইতিমধ্যে মিথিলেশ তপোধীরের মনভ্রূণ থেকে 'শতক্রুতু' প্রকাশের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। প্রকাশ মুহূর্ত থেকেই শতক্রুতু হয়ে উঠেছে সাহিত্য পত্রিকার সম্পূর্ণ প্যাকেজ। লিটল ম্যাগাজিন যেমন হয়, তারুণ্য এবং স্থিতাবস্থার প্রতিবাদ। কবিতায় তখন শহর প্রতিষ্ঠিত 'অতন্দ্র' গোষ্ঠীর নিষ্ঠায়। কিন্তু কাছাড় সাহিত্যের দুর্বলতর অংশ গদ্যসাহিত্যের দিকে স্বাভাবিক কারণেই শতক্রুতুর পক্ষপাত নির্দিষ্ট হয়ে গেল দুই শক্তিমান লেখকের আগমনে, মিথিলেশ ও শেখর তখন যা লিখছে তাতেই হয়ে উঠেছে পাঠক প্রিয়। মিথিলেশ লিখল, 'ছারপোকা' শেখর 'ক্রমশঃ তাপ'। তখনও বরাক উপত্যকা কথাটির চল হয় নি, কাছাড় নামেই পরিচিত বাংলাভাষী প্রান্তিক জনপদের। শতক্রুতুর শক্ত পাদানিতে তারপর পা রাখলেন অনেক নবীন প্রতিভাধর কথালেখক। যেহেতু নাম নামানোর উদ্দেশ্য নয় এই প্রস্তাবনার, তাই বারান্তরের অছিলায় থাকুক না হয় সময় সত্তরের বরাক উপত্যকার কথাসাহিত্য। লেখক শেখর দাশ একে একে লিখলেন কত কথা, 'ফেরারী' পড়েই কি শক্তিদা, কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী রবিবারের 'যুগান্তর' এ লিখলেন 'কলেজ ফাটানো লেখক।'

'ডায়নোসরের ফুসফুস' লিখতে লিখতে আর মন ভরে না লেখকের। সিনেমার ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষা মিশিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা-কথা কজন জানে, শেখরের এক গোঁ মিলিয়েই ছাড়বে। পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করেছেন, মহাশয়ের বিচারে শেখর দাশ লেটার মার্ক সহ যে উত্তীর্ণ সে সত্য নাকাচ করবে কে। 'শতক্রুতু' পর্যায়ে শেখর ইতিউতি খুব একটা লেখেন নি, সেই সময় একান্ত এক দৈবিপাকে তার লেখায় আসে সাময়িক বিরতি। মাঝখানে হৃদযন্ত্রের বৈকল্যে চরকিপাকের চলাফেরায়ও আসে ব্যাঘাত। প্রায়া ঘরবন্দী সময়কালে লেখা হয় 'আজান' এর মতো ছোটোগল্প, 'বিন্দু বিন্দু জল' এর মতো কালজয়ী উপন্যাস।

নবপর্যায় 'শতক্রুতু' শুরু হওয়ার আগে সিনেমার ভাষায় লেখার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে শেখরকথা। মেদিনীপুরের 'অমৃতলোক' এ লিখেছেন গল্প, সমীরণ মজুমদার বের করেছেন তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কোষাগার' যার অসমিয়া অনুবাদও বেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অক্ষর পাবলিকেশন আগরতলা থেকে বের হয়েছে 'মোহনা' আর

'বানজারা'। শেখর দাশের লেখালেখির আর একটি বৈশিষ্ট তার ভাষা বৈচিত্র, গ্রামীণ প্রান্তিকায়িত জীবনের কথাভাষায় থাকে মাটির সুবাস, আর নাগরিক মধ্যবিত্ত তথা উচ্চবিত্ত জীবনের চালাকি প্রকাশ পায় তার বাংলা হিন্দি উর্দু ইংরেজির মিশেলে তৈরি এক নবভাষায়। যা অনেক সমালোচকের সহ্য হয়নি, কথা রচনার রহস্যভেদ করতে পারেন নি বলে বলেছেন, শেখর দাশ ফিনিশড। যে 'আজান' লিখেছে 'ফেরারী' লিখেছে 'জোড়শালিক' লিখেছে, 'শব্দের প্রতিচ্ছবি' লিখেছে, সে কি ফিনিশ হওয়ার কথাকার। তখন সেই সত্তরের গল্পঢেউয়ে উত্তাল করেছিল বরাক উপত্যকার কথাকারেরা সংলাপ এবং বর্ণনার চমৎঠকারিত্বে, পাঠকমনে স্থান করে নিয়েছিলেন চিরকালীন। এখনও পাঠক মনে করতে পারেন মিথিলেশের সংলাপ, 'সমুদারিয়া তু ঘরকে যা' তপোধীরের 'শান্তা শানু শানুয়া তুমি শাম্পু দিয়েছে চুলে' আর শেখরের বিখ্যাত বর্ণনা 'শহর নয় ছাউনি' 'বিশওয়ানাথ প্লেইড ডিফেন্সিভলি' এসবই জীবনানন্দের শঙ্খমালা, এ-পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর। শেখরকে নিয়ে সে সময় সত্যিই 'ট্রাপিজ ট্রাপিজ' খেলা, শিলচরে কত পুরস্কার, প্রথমদিকে শেখর দাশের স্বভাব সুলভ প্রচার বিমুখতা এসব প্রত্যাখান করেছে, শেষদিকে কিছু ঢেঁকি গিলেছে। তবু শেখর দাশ এক অপার বিস্ময় বাংলার গদ্যসাহিত্যে। যখন গল্প লেখা হচ্ছে না, যখন চলছে খরার সময় তখন শিলচর রিভারভিউ থেকে কলকাতায় মধ্যরাত্রে দূরভাষে শুনিয়েছে ওর কবিতা, উর্দু শের। বলেছে তার পরবর্তী লেখার প্রস্তুতিকথা। আর দুম করে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে মৌনী সন্যাসী হয়ে যাওয়ায়ও তার জুড়ি নেই, অভিমান তো মিষ্টি কথা।

এ বছরই, কয়েকমাস আগে সফল শৈল্যচিকিৎসার পর আবার বলেছে তার নতুন উদ্যমকথা, ম্যাগনাম ওপাস নতুন উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ'র প্রস্তুতিকথা। অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ শুনিয়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে গদ্যভাষার নতুন প্রকাশশৈলীতে। ঠিক যেভাবে সে আমাদের চমকে দিয়েছিল 'বিন্দু বিন্দু জল' প্রকাশের পর। প্রকাশ কোথায়, মুখ দেখিয়েই লুকিয়ে পড়েছিল, প্রথম কিস্তির প্রথম পরিচ্ছেদের পর সেই সাময়িকপত্রেরই আর দেখা পাওয়া যায় নি। বরাক উপত্যকায় তখন ধারাবাহিক পত্রিকা প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা ছিল আর্থিক। তবে, যতটুকু পড়েছি কিংবা পড়েছে উত্তর পূর্বের পাঠক তাতেই মজেছে, কারণ সেই সময় শেখর দাশ মানেই দুর্দান্ত আকর্ষণ স্মার্ট রসবোধে ভরপুর গদ্য যা এর আগে উত্তর পূর্ব ভারতের বাংলাভাষা উপভোগ করে নি। শহুরে গদ্যের নবীন বিগ্রহ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়া শেখর দাশের উপন্যাসা, তাও দেশভাগের

মতো বিষয়, যা নিয়ে তখনও লেখালেখির শুরু হয়নি বাংলাভাষায়। দেশভাগের আখ্যান বলতে তখনও 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' আর 'কেয়া পাতার নৌকো।' তৃতীয় বলতে 'বিন্দু বিন্দু জল', সুরবালা আর বসুমতীর সমান্তরাল আখ্যান, যা সুখী গ্রামীণ পরিবারকে করে দেয় তছনছ, দোষ কারও নয়, হিন্দুর না মুসলমানেরও নয়, সর্বকালের ঘৃণ্য রাজনীতিই দু'ভাগ করে দিল বাঙালির জল মাটি আকাশ মন আর মানুষ। সেই দুর্দৈব কথার বাখানি শোনাতে লেখা হয়নি 'বিন্দু বিন্দু জল', ছিন্নমূল যাযাবরের নতু ছাউনিতে যে সুখের বসত হওয়ার কথা ছিল, তা হয় নি,ন প্রতিস্থাপিত সংসারের সঙ্গে আর মাটির যোগ হয় না, কী হয় কী হয় সমস্যার টানটান উত্তেজনায়, নতুন প্রজন্মের স্বার্থপরতার বিশ্লেষণী উন্মোচন পাঠককে সমাজতাত্বিক কাঁটাছেঁড়ায় উদ্বুদ্ধ করলেও ছিন্নমূলের প্রাপ্তি নিয়ে উত্তরকালের প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হবে খণ্ডকারী ইতিহাসকে।

আমরা জানি না 'নীলকণ্ঠ' লিখিত হবে কি না, কারণ সৃষ্টিকর্তার খেয়ালি মনের কথা কে জানে। তবে এই প্রজন্মের পাঠকের জন্য 'বিন্দু বিন্দু জল' এর 'স্রোত' সংস্করণ নবীন পাঠকের কাছে শেখর দাশকে ফিরিয়ে দেবে তার স্বমহিমায়।

রণবীর পুরকায়স্থ

প্রশস্ত উঠোনের তুলসী বেদির কাছে এলেন সুরবালা। বড় এক পিলসুজ আছে পাকা বেদিতে। আজ পরিপূর্ণ করে ভরলেন তেল। অন্যদিন এত তেল দিতে হয় না। ঘন্টাঘানেক জ্বলে, এমন পরিমাণ দিলেই হয়। আজ দিলেন পূর্ণ পিলসুজ। চাঁপাফুল সদৃশ তপ্তশিখা জ্বলে আন্দোলিত হল। একটু হাওয়ায়, কম্পিত শিখার নরম আলো এদিক ওদিক। ছড়িয়ে যাওয়া আলোয় স্বল্পকালীন সন্ধ্যার আঁধার বিলীন। সম্পন্ন গৃহস্থালি ম্রিয়মান আলোয় সতেজ।

তেল ভরা শেষ হলে সুরবালা কিছু সময় নিশ্চুপ দাঁড়ালেন। বেদির উপর আলতো ডান হাতের আঙুল। কাল কে দেবে তেল ? কে ভরবে ? এ তেলে যদ্দিন জ্বলে জ্বলুক। হাওয়ার উৎপাত না হলে দুটো দিন তো জ্বলবেই। জ্বলতেই হবে।

কাল ভোর-ভোর সময়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। বসির রিয়াজ পীতাম্বর গোরুর গাড়ি নিয়ে আসবে খুব ভোরে। ওরা এগিয়ে দেবে নিরাপদ স্থান অবধি। আজ দুপুরে জানিয়ে গেছে। বিশ্বস্ত লোক এরা। কতকালের। সুরবালার এটাই স্বস্তি।

আজই তো এ ভিটের শেষ সন্ধ্যাবাতি। কত পুরাতন পুরুষাণুক্রমের ভদ্রাসন। কত জননী এখানে জন্ম দিয়েছেন বংশের ক্রম। হালকা শিশিরের মতো এসব ভাবনা সুরবালার ভেতর হিমানীপাত ঘটায়। ছোট্ট শ্বাস ফেলেন একবার। স্বল্প শঙ্কায় বার বার লক্ষ করছেন, যতটুকু তেল ভরা হল—সারারাত জ্বলে কাল ভোর অবধি জ্বলবে তো ? এও ভাবছেন সুরবালা নিষ্প্রদীপ ভিটে পেছনে ফেলে রেখে এভাবে চলে যাওয়া কি সমীচীন হবে ? না। কাল ভোর অবধি অবশ্যই জ্বলবে পেতলের পিলসুজের উলম্ব শিখা।

একবার নিভিয়ে দেওয়া সলতেয় আবার আগুন দিলেন সুরবালা। নিরিবিলি উত্তাপসহ লকলকে শিখা জ্বলতে থাকে। মায়াময় আলো ছড়াল আবার।

ঝাঁকড়া তুলসী গাছে তুলসীর অজস্র বোল। সন্ধ্যার গৃহাস্থালির আলো জ্বলে। বাইরে, সদর পেরিয়ে কাছারি বাড়ির উত্তরে বড় দীঘি থেকে সারসার সুপারি গাছ, নারকেল গাছের পাতায় হিল্লোল তুলে বয়ে আসে শীতল বাতাস। বাহির বাড়ির দক্ষিণে গোয়ালেও কয়েকদিন আগে জন্ম নেওয়া চপল বাছুরের ডাক আসে কেবল। মা-গোরুটা বাছুরের ডাকে সাড়া দিল ক্ষীণ।

মাথা নোয়ালেন সুরবালা বেদির উপর গলায় আঁচল জড়িয়ে। আঁচলের খুঁটে একগুচ্ছ চাবি। শব্দ হল—ঝনাৎ। প্রণাম সেরে মাথা তুললেন আবার। একই ভাবনা—কাল এমন সময় আলো

দেওয়ার কেউ থাকবে না। কে কোথায় চলে যাবে গোটা বসত প্রায় অরক্ষিত রেখে। এ চাবি দিয়ে কী হবে ? রেখে দিলেন বেদির উপর। মনে মনে বললেন, ঠাকুর, তুমি দেখো। তোমার কাছে রইল। যদি ফিরে আসা যায়, তখন আঁচলে বাঁধব আবার। আর কি ফিরে আসা যাবে ? যেন যায়। এভাবে খড়কুটোর মতো ভেসে ভেসে কোথায় থাকব আমরা ? কী যেন মনে হল। ইতস্তত করে আবার তুলে নিলেন চাবির গোছা। হাতেই রইল। বাঁধলেন না আঁচলের খুঁটে।

পারুল কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল নেই। ছটফটে মেয়েটা আজ বড় বেশি শান্ত হয়ে গেছে। সুরবালার বাঁ-কনুইয়ে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, আজ এত তেল কেন মা ?

সুরবালা বললেন, যতক্ষণ জ্বলে জ্বলুক না। কাল এমন সময় আলো দেওয়ার কেউ থাকবে না এ বাড়িতে।

—কেন ? অশ্বিনী কাকা তো থাকছে।

ম্লান হেসে সুরবালা বললেন, শুধু ও কেন, দশরথ, পুতুও থাকবে।

—তাহলে ? ওরা আলো দেবে না ?

—ওরা কী আর তেমন করে আলো দেবে, যেমন আমি দিই। সেজদি দিতেন, তোর ঠাকুমা দিতেন, তোর ঠানদি দিতেন। এমন এরা দেবে না।

পারুল চলে এল এবার বেদির উল্টো দিকে। সুরবালার বিপরীতে। ওর কচি সুশ্রী মুখে সারাদিনের ক্লান্তি। ওর সবচে প্রিয় পুরনো টিলা ঘুরে এসেছে কয়েকবার। রং বেরঙের ছোট ছোট নুড়ি তুলে এনেছে সারাদিনে। ওদেশে যদি ওসব না পাওয়া যায় ? কী করবে এসব রঙিন নুড়ি দিয়ে, পারুল জানে না, তবু তুলে এনে জমায় ওর বালিকাসুলভ মহার্ঘ সঞ্চয়। এমন অনেক অপার্থিব সঞ্চয় আছে পারুলের।

ওর শ্রান্ত মুখে পিলসুজের নরম আলোর দ্যুতি। দুষ্টুমি ভরা চোখ আজ ভীষণ নিরিবিলি। ঘন কালো চুলের গুঁড়ো কপালে এলানো। দুকলি সুদৃশ্য সুগড়ন ঠোঁট অল্প খোলা। সামনের ধবধবে দাঁতের নিম্নভাগ অল্প দেখা যায়। বাঁ হাতের তিন আঙুলে কপালের বিস্রস্ত চুল সরায়। একবার শিখার উলম্ব আলোর উৎসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার তাকায় সুরবালার দিকে। বলে, দশরথ দাদু, অশ্বিনী কাকা, পুতুদা ওরা যাবে না মা ?

—যাবে।

—আমাদের সাথে যাবে না ?

—না।

—না কেন ?

—যতদিন টিকে থাকতে পারে দেখে শুনে রাখবে। যদি ফিরে আসা যায় আবার এ আশায়।

—ওরা খাবে কীভাবে গো ?

—কেন ?

—ওদের কাউকে কোনোদিন রাঁধতে দেখিনি। একটু হাসলেন সুরবালা। বললেন, অশ্বিনী খুব ভালো রাঁধে, তুই দেখিসনি কখনো।

—পুতুদা ইস্কুলে যাবে না ?

—না রে।

—কেন ?

সুরবালা ধমকালেন। তারপর বললেন, আজকাল ইস্কুল-টিস্কুল কি খোলা আছে কোথাও ? তোরও তো বন্ধ।

—কয়েকজন মাষ্টার মশাই চলে গেছেন, তাই। এমনিতে এখন কোনো বন্ধ নেই। তুমি জানো না।

সুরবালা বললেন, হাতমুখ ধুয়েছিস ?

—হুঁ।

—আর চুল ? কে আঁচড়াবে এ জঙ্গল!

এ বয়সেও চুলের প্রলম্বিত ঢল পারুলের পিঠে, গালের দুপাশে। কিন্তু বড়ই অগোছালো। বলল, পরে আঁচড়াব।

—পরে না। সন্ধেবেলা এভাবে চুল ছেড়ে কেউ রাখে ?

—কী হয় ?

বাঁশের ছোট্ট কাঠি দিয়ে সলতে খুঁচিয়ে আরো উস্‌কে দিলেন পিলসুজের আলো। সুরবালা বললেন, প্রণাম কর।

—কোথায় ?

বেদি দেখিয়ে সুরবালা বললেন, কোথায় আবার ? এখানে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় পারুল একটু প্রণাম সেরে নিল। মাথা পেছনের দিকে ঝুঁকিয়ে একবার দুদিকে দোলাল। ঘাড়ের পেছনে, মাথার উপর চুলের গোছা তুলে পূর্ণবয়স্ক মেয়েদের মতো অপটু হাতে খোঁপা বাঁধল একটা। হয়ে গেল চুলের গোছগাছ।

গোছাতে না গোছাতে আবার খুলে গেল খোঁপা, অবিন্যস্ত হল চুল। বিরক্তির শব্দ করল একবার। তারপর সুলবালাকে বলল, কাল আমরা যেখানে যাব ওদেশটার কী নাম গো ?

সুরবালা আস্তে বললেন, ইন্ডিয়া।

পারুলের স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, আর এটা ? এটাও তো ইন্ডিয়া ?

চাবির গোছা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে সুরবালা বললেন, না রে, সব ঠিক আছে। শুধু নামটা বদলে গেছে।

ধবল বাছুরের ডাক আবার শোনা যায়। স্তন্যদায়িনীকে ডাকে। বাছুরের মা, যে পারুলের সই সরমা, সাড়া দেয়। ক্ষুধার্ত বাছুরের আব্দার মেটাবে একটু পর হালকাভাবে এমনি আভাস দেয়।

সদরের দীঘি থেকে বয়ে আসে মিহিন হিম। একটু দূরের লাউমাচায় ঝুলে আছে বেশ কয়েকটা বাড়ন্ত ফসল। দোলে হালকা হাওয়ায়। জ্বলন্ত শিখার মধ্যিখানে দ্রুত আঙুল নাড়াচাড়া করে পারুল—এও পারুলের প্রিয় খেলা। কোনো দহন হয় না, এত দ্রুত অতিক্রম করায় তর্জনী

শিখার উত্তাপে। এখনো করে। সুরবালা দেখছেন সব। বলছেন না কিছুই। কিছুটা অন্যমনস্ক। পারুলের বাবার চিন্তা কুরে খায় অভ্যন্তর। সেই যে ওরা সীমানা পার করে পরে খবর দিল, 'বর্ডার' পেরিয়েছেন নির্বিঘ্নে। এরপর আর কোনো সংবাদ নেই। কোথায় উঠল ? প্রদ্যুম্ন-র ওখানে ? পারুল তো ভয়ানক রেগে আছে বাপের উপর। বলেছে যখন দেখা হবে—একটাও কথা বলবে না। শিখার শান্ত আলোয়, পারুলের আয়ত চোখের তারায় যুগপৎ খেলে যায় আশা নিরাশা। বলে, আমরা আর এখানে ফিরে আসব না মা ?

একটু সময় নিয়ে সুরবালা ভার ভার গলায় বললেন, —কে জানে! ফেরা না ফেরার কথা আজকাল কেউ কী বলতে পারে ? তুই ভেতরে যা। হিম পড়ছে। ঠান্ডা লাগবে।

কোনো কথা না বলে পারুল তবু দাঁড়িয়ে থাকে শিখার মায়ময় আলোয়।

নাছোড় বাছুর ডাকে আবার। স্তন্যদায়িনী সাড়া দেয় না। সব লক্ষ করে তুলসীতলা ছেড়ে পারুল এগিয়ে যায় গোয়ালে। আলাদা বেঁধে রেখেছিল পুতু বাছুরটাকে কেন যে, সেই জানে।

বাঁধন খুলতে খুলতে পারুলের গলা সপ্তমে ওঠে। জোরে ডাকে, পুতুদা, এই পুতুদা।

পুতুর কোনো সাড়া নেই। কোথায় গেছে এখন, বোঝা গেল না। তেমনি ধমকের গলায় পারুল সোচ্চার, মা, ও মা।

শান্ত গলায় সুরবালা বললেন, চেঁচাচ্ছিস কেন ? কী হয়েছে ?

—পুতুদার আজ রাতের খাবার বন্ধ।

—কেন রে ?

—চরণের খিদে পেয়েছে। বেঁধে রাখল কেন ? এক ফোঁটা জলও দেবে না ওকে, বলে রাখছি।

পারুলের মেজাজ সবাই জানে। সুরবালা কিচ্ছু বললেন না। ততক্ষণে বাঁধনছাড়া চরণ ছুটে গিয়ে মুখ দিয়েছে ভরন্ত বাঁটে। স্তন্যদায়িনী বিনম্র আবেশে বলে—হাম্বা।

দুই

মাঝরাতে ত্রাস শুরু হয়ে গেল। ঠিক মাঝরাত নয়, একটু পরে। তখনো দ্বিপ্রহর নয়। উত্তর-পশ্চিম কোণের হুল্লোড় ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল গোটা গ্রামে। মোট তেইশ ঘর পরিবারের ছোট বসত। গ্রামের দক্ষিণে খোলামাঠ পেরিয়ে দূরে বাঁশবন। পুবে যাওয়া যাবে না। হাওরের নীচু থলজমি ওদিকে। এমন সময় প্রায় কোমর সমান জল, হাওর তেমন বড় নয়, গত কদিন এক-নাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছে। গত পরশু থেকে বৃষ্টিবাদলা তেমন নেই। ভোটাভুটির দিন এদিকে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। এ গ্রামের কেউ ভোট দিতে পারেনি। ভাড়াটে সশস্ত্র লস্কর গোটা গ্রাম ঘিরে রেখেছিল। কয়েকজন জোর করেছিল ভোট দেবে বলে। লোকগুলো প্রথম নরম কথায়, একজন একটু বেপরোয়া হতেই ওরা সেদিনই স্পষ্ট বুঝেছিল হাওয়া পুরোপুরি বিষাক্ত। সাপের হিসহিসানি হাওয়ায় এরা কেউ পরিচিত ছিল না। ভাড়াটেদের নানা দিকে তুলে এনে কাজ ধরিয়ে দেয় ওরা। ওরা বলতে কারা—এ ধারণা, এই ঘুম ঘুম আপাত শান্তগ্রামের কারোর নেই। চার পাঁচজন ছাড়া, গ্রামের প্রায় সবাই নিরীহ। কারণ, এলাকার ভূগোলটাই এমন। গ্রামের একদিকে ঘন বাঁশবন।

আর একদিক তেমন বিস্তৃত নয় এমন এক হাওর। হাওরের মাঝে মাঝে 'মেটিটিল্লায়' হিজল গাছ। হাওরের জলে মরশুমি মাছ। বেশ কয়েকটা জেলে ডিঙি। রোদে মেলে দেওয়া নানা আকারের জাল। নতুন কোনো (কুমা কাঠের) নৌকায় সবে মাখানো আলকাতরার গন্ধ। জল মিশ্রিত কাদায় কচুরিপানা, নানা উদ্ভিজ-কান্ডের পচনের হাল্কা গন্ধ। যেদিকে মাঠ, মাঠের পর ঝাকড়া, অনেকগুলো বাঁশঝাড় সারিবদ্ধ। গ্রামের দু-একটা ঘরছাড়া বাকি সব ছন বাঁশের, তবে ছিপছাপ, মোটামুটি সম্পন্ন। গ্রামের ঠিক মাঝখানে দশজনের (বারোয়ারি) দীঘি। এছাড়া প্রায় প্রত্যেকের বসতবাড়ির পেছনে, ছোট ছোট পুকুর। গ্রামে আম, লিচু, কাঁঠাল, তেঁতুল, সুপারি গাছের অভাব নেই। কয়েক জায়গায় দীর্ঘ গাছ নারকেলের।

বর্ষায় গ্রামের মাথায় মেঘলা আকাশ। গুড়গুড় মেঘ ডাকে যখন সন্ধ্যায়, হাওর থেকে কই-মাগুর ডাঙায় উজায়। ব্যাঙেরা ডাকে একটানা, ঝিঁঝিও। নীরব পাখিরা গাছে গাছে ঘুমোয়। টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ে ছনের চালে। হালকা শব্দ হয় যেন নূপুরের, এমন শব্দ বৃষ্টিরও। ঠিক এমন মেঘলা সন্ধ্যা পেরুনো প্রথম রাতে নাতি নাতনির বায়না মতো কোনো পিতামহী 'কিচ্ছা' (গল্প) শোনায়—'বুড়িদুড়ি জানি না আমি লাউ গড়াগড়ি বাই / লাউয়ের ভিতর থাকিয়া আমি তেঁতই চিড়া (তেঁতুল চিড়া) খাই'। কিংবা বিপদনাশিনীর একই উপাখ্যান—'হারান ধনে ঘর লয় / কাটা মাথা জোড়া নেয়।'

ক্লান্ত ঠাকুমার গলা অবশ হয়ে আসে। নাতি নাতনি গল্প শুনতে শুনতে নিজেদের মনগড়া চিত্রকল্প তৈরি করে। কাটা মাথা জোড়া লাগায়।

ওদিকে, কত মুন্ডু যে গড়াবে, জোড়া দেবে না কোনোদিন—এ খবর তেমন জানে না কেউ। তবু উড়াউড়ি অনেক কথার ছোবল আসে—সামনের দিন কেমন, কেউ বলতে পারে না। তবে দিন ভালো নয়, এ আশঙ্কা সবার বুকে। কেঁচোর মাটি খোঁড়ার মতো, অশান্তি অস্বস্তি খনন করে ধীরে ধীরে।

দিনের আলো ফুটলেই, আবার মাঠ, ধানের চারা, থইথই মাখন মাখন কাদায় বপনক্রিয়া। বপন হলেও, বপনের হাত আবার ফসল কাটার অবকাশ পাবে না, এ অনুমান করে অনেকেই। গ্রামের এমন ভূগোলে কে না শান্তি চায়।

গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে প্রসারিত নাটমন্দির সহ কয়েকটা বিগ্রহ। আক্রান্ত হওয়ার একটু পরই সবাই ছুটল প্রথমে মন্দিরের দিকে।

একজন মধ্যবয়স্ক চেঁচিয়ে বলল, না না, ওদিকে না। নাটমন্দিরে জড়ো হলে সবাইকে একসাথে পেয়ে যাবে। বন্দুক আছে ওদের। ওরা সংখ্যায় বেশি, অনেকজন হতে পারে। বাঁশ বনের দিকে দৌড়াও সবাই। যে যেমন পারো, ছিত্‌রে পড়ো রে।

এ গ্রামে আক্রমণ প্রতিহত করার মতো যুবক ও সমর্থ পুরুষের সংখ্যা কম। নিরীহ গৃহস্থ সবাই। নাটমন্দিরের পথ ছেড়ে সবাই ছুটল মাঠের দিকে। মাঠে পায়ের পাতা জল, কাদা, পুরুষেরা ছুটছে কিন্তু বাচ্চা নিয়ে স্ত্রীলোকেরা কাহিল। দু-একজন ছিটকে পড়েও গেল। একজনের কাঁখ থেকে দূরে প্রায় উড়ে পড়েছে বছর তিনেকের একটা মেয়ে। জলও নরম মাটি বলে তেমন চোট

পায়নি। তবু ঘুমন্ত চোখে আচমকা ছিটকে পড়ায় জোরে চেঁচাতেই ডানহাতে সজোরে চেপে ধরেছে মুখে, ওর মা। কান্নার শব্দের হদিশ যেন ওরা না পায়। ফুটফুটে অন্ধকার। আকাশ তেমন মেঘলা নয়।

কিছু তারা আর খন্ড বিখন্ড ভেজা মেঘ আকাশে। এরই আলোয় ত্রাসে ছুটছে সবাই। ঝপার ঝপার শব্দ হচ্ছে মাঠের জলে। ছুটন্ত বালকের হাত ধরে মাও ছুটছে। বৃদ্ধবৃদ্ধারা তেমন দৌড়াতে পারে না। তবু ছুটছে। কোথাও না কোথাও লুকোলে যদি প্রাণ বাঁচে। একমাত্র ভরসা ঘন বাঁশবন।

মাঠ পেরিয়ে বিশাল বাঁশবন বিশ্বাস মন্ডলদের এজমালি। চক্রবর্তী পুরোহিতেরও কয়েকটা ঘন ঝাড় আছে দক্ষিণের শেষ মাথায়। ওদিকে ফলন্ত বেলগাছও আছে অন্তত পনেরো কুড়িটা। সবগুলো ভবেন মাষ্টারের।

সঙ্কটার গরমে মাথা চড়ে যায় যখন, লাল শালু পরে গ্রাম-বেগ্রাম ঘুরে বেড়ায়। হাতে ত্রিশূল। কপালে গোলা সিঁদুর। 'শিব শিব' বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচায় প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধা। দুটো চোখ আংটার মতো জ্বলে। একবার টান মেরে গায়ের সব কাপড় খুলে পুরোপুরি বিবস্ত্র। এ অবস্থায়ই হাতের ত্রিশূল নিয়ে ছুটে গিয়েছিল বেল গাছগুলোর দিকে। কেউ বেল পাড়ছে জানলেই হয়ে গেল।

যক্ষের মতো আগলে রাখে বেল গাছ। পাকা বেল এমনি মাটিতে খসে পড়লে শক্ত খোল ফাটিয়ে কাকেদের খেতে দেয়। জোরে ডাকে, 'আয়, আয়। কাকবলি নে, আমার কাকবলি নে'। হাতের ত্রিশূল ও কপালের সিঁদুরের লেপনে কাকেদের বুঝি বিষম শঙ্কা, ওরা 'সঙ্কটা'কে এড়িয়ে যায়।

অন্য পাখি বা আর কেউ খেয়ে নেয় হয়তো। সারসার বেলগাছের পর জীর্ণ এক শ্যাওড়া গাছ। ভৈরবের ভোগ দিয়ে গেল হয়তো কেউ। কলার খোলে দেওয়া ভাত মাছ সব খেয়ে নেয় 'সঙ্কটা'। কেউ কিছু বলে না। ষাটোর্ধ্ব নারীদেহে গ্রামের সবাই হয়তো ভৈরবের অস্তিত্ব খুঁজে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আশ্বিনের পর থেকে সঙ্কটা আবার স্বাভাবিক। তখন দেখলে মনে হয় না, এ মানুষটা বছরের কয়েকটা মাস পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যায়। শীতের সময় দেখলে যে কেউ ভাববে উনি বোধহয় পরমহংস-জায়া সারদামণির সহোদরা—এতই সাদৃশ্য। ভবেন মাষ্টারের বাবা হরেন মোক্তার সদরের কোর্টে কাজ করে। লোকমুখে শোনা যায়—ওখানে ভিন্ন স্ত্রীলোক রেখেছে। মোক্তারের পসার ভালো। ভবেন জায়গা জমি সামলায়, মরশুমি উন্মাদ জন্মদায়িনীকে সামলায়। বাপকে আর মাকে কোনদিন চোখে দেখেনি, সেই কল্পিত স্ত্রীলোকের বৃষোৎসর্গ, আদ্যশ্রাদ্ধ যুগপৎ করে—যখন বিবস্ত্র মা ঠায় শুয়ে থাকে বেলগাছের তলায়। ভবেনকে দোষ দেওয়া যায় না। নিজের মাকে কে না মায়া করে? গত চৈতের শেষে, মাত্র চারদিনের জ্বরে 'সঙ্কটা' দেহ রাখে।

বাঁশবনের পর একফালি পতিত জমি আছে মোক্তারের, ওখানেই মায়ের মুখাগ্নি করে ভবেন মাষ্টার, মা তখন সারদামণির ছোটবোন। পুরোপুরি সুস্থ।

বছরের এ ঋতুতে তো উন্মাদ থাকে 'সঙ্কটা'। আজ এ মুহূর্তে জীবিত থাকলে কী করত ? হয়ত ত্রিশূল হাতে ছুটে যেত হামলাকারীর মোকাবিলায়। ত্রাসে ছুটতে ছুটতে এ কথাই মনে হল ভবেনের।

আতঙ্কিত চিৎকার ও শব্দে বসুমতী উঠে বসেছে। হল্লাটা এখন হচ্ছে গ্রামের মাঝামাঝি। ঠেলে তুলল দ্বিজেনকে। মাঝরাত অবধি সজাগ থেকে চোখ লেগেছে একটু আগে দুজনের। আধঘন্টাও ঘুমোয়নি। একমাত্র সন্তান রাতুল, ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে দ্বিজেন বলল, দেখছ কি। ওকে কোলে নিয়ে বেরোও তাড়াতাড়ি।

বসুমতীর শঙ্কিত প্রশ্ন,—কোথায় গো!

—সবাই যেদিকে ছুটছে। আগে বেরোও তো।

ঘর ছেড়ে ওরা ছুটল মাঠের দিকে। একবার দরজাটা ভেজান হল কেবল, তালা দিল না। সে অবকাশ নেই।

উগ্র কোলাহল ছড়িয়ে পড়েছে গোটাগ্রামে। হামলাকারীরা পুরো দখল নিয়েছে। প্রায় সবাই, মাঠ পেরিয়ে ছুটছে বাঁশবনের দিকে। বাঁশবনের শেয়ালেরা অনেক আগে অন্য কোথাও পালিয়ে গেছে। হামলাকারীদের এদের উপর কোন রোষ নেই। হয়তো দূরে দাঁড়িয়ে মানুষের জান্তব ক্রিয়াকলাপ দেখছে। জন্তু মানুষ হয় না, কিন্তু মানুষ যখন জন্তু হয়, এ দৃশ্যে ইতর প্রাণীদের বুকও কাঁপে। ভীত শেয়ালের দল তেমনি হয়তো কোথাও লুকিয়ে দেখছে নারকীয়তা—মানুষ হিংস্র পশুর চেয়েও কত নির্মম হতে পারে পশু হিংসায় হত্যা করে না। প্রবৃত্তি সব করায়। হিংস্রতার পাঠ মানুষই পশুকে দেয়। এখন যেমন। তবু পশু সব পাঠ নেয় না। দা-র এককোপে এক শিশু দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। কান্নার বিন্দুমাত্র শব্দ বেরোয়নি। খণ্ডিত শিশুর মার উরুসন্ধি ফালাফালা করে দিচ্ছে বিভিন্ন বয়সের অন্তত গোটা দশ/এগারোজন বলিষ্ঠ পুরুষ। তারপর উদোম নরম শরীরের যৌনাঙের একটু উপরে তীক্ষ্ণ শাবলের 'পাড়' (এফোড়-ওফোঁড় বিঁধে দেওয়া)। এর আগেই এই স্ত্রীলোকের স্বামীর মুণ্ডহীন শরীর উঠোনের তুলসী বেদির তলায়। কাটামুণ্ডুর চুল ধরে দূরে কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এক হামলাকারী বাতিল পুঁটলির মতো, একটু আগে। অন্যান্য শ্বাপদসহ সব শেয়ালের এসব দৃশ্য সহ্যাতীত।

ছুটছে সবাই। কয়েকটা পরিবার এখনো আসতে পারেনি। অস্ত্রের ঘায়ে লুটিয়ে পড়েছে কিংবা অন্যদিকে পালিয়েছে। যারা এদিকে এসেছে, তারা ছুটছে কেবল। সবাই 'সঙ্কটা'র শ্মশান পেরিয়ে গেল। মোক্তার ছেলেকে বলেছিল, ওখানে তোর মায়ের স্মৃতিমন্দির তৈরি করা যাবে রে ভবেন। 'লাকি' ধানের ফসল উঠলে সব ধান বেচে দেওয়া হবে। এতে খরচ উঠে যাবে। কাষ্টগড়ের বুলনকে বলছি, সুন্দর একটা কলস গড়ে দেবে। মন্দিরের মাথায় বসানো হবে কেমন ? তোর মত আছে ?

ভবেন জানে, বাপের এসব সাময়িক আবেগ বা ছেলেকে ফুসলানো। মন্দিরও হয়নি, সুতরাং কোনো তৈজস বসানো হয়নি ছেলে-ভোলানো কল্পিত মন্দিরের মাথায়।

নিবারণকে দিয়ে বাকাল বাঁশের 'গর্চি' বেড়া করে দিয়েছিল ভবেন চতুর্থীর পূরকের পরদিন।

ভবেনের ইচ্ছে ছিল ছোট বেদি বানাবে। তাও হয়নি। তারপর ভাবল, বৎসরান্তের পর গাঁথনি দেবে। হয়নি। এখনো বছর পূর্ণ হয়নি। ছুটন্ত মানুষের ধাক্কায় কয়েক মাসের পুরোনো বাঁশের কঞ্চি ভেঙে যায়। যেন একেবারে বিবস্ত্র হয়ে যায়, নিতান্তই অবহেলায় পড়ে থাকা সারদামণির 'সহোদরা'র শ্মশান।

অজস্র পা মৃত্যুভয়ে মাড়িয়ে যায় 'সঙ্কটা'কে। 'সঙ্কটা'র ত্রিশূল যে কোথায় গেল কেউ জানে না। আসলে ভবেন ফেলে দিয়েছিল ভেড়ামোহনা গাঙে। ন্যাকড়ায় মুড়ে নিয়ে গিয়েছিল একদিন। বাঁশবনে ঢুকেই যে যার যেদিকে উপযুক্ত বুঝল ছিতরে গেল। দাঁড়িয়ে রইল না কেউ। সকলেই বসে পড়ল আড়াল অন্ধকার খুঁজে।

এভাবেই সময় গড়ায় বেশ কিছুক্ষণ। অন্তত এক-দেড় ঘন্টা। দূর গ্রাম থেকে ভেসে আসছে হল্লার শব্দ। পশ্চিমের কয়েকটা ঘরের মাথায় আকাশে উঠে যাওয়া হলুদ আগুন। চড়-চড় দহনের শব্দ বাঁশবন থেকেও শোনা যায় অস্পষ্ট। হুল্লোড়ের শব্দ হামলাকারীদের। গ্রামের মাঝামাঝি এবার নতুন আগুনের শিখা। সব জ্বলছে। সময়ও গড়ায়। ত্রাস বাড়ে বাঁশবনে। হঠাৎ খেয়াল হয় বসুমতীর—অনেক সময় হল ছেলেটা কিছুই খায়নি। একটানা ঘুমোচ্ছে। শেষরাতে রোজ জেগে ওঠে। চেঁচামেচি করে। তখন বুকের দুধ চাই।

আজ এত চুপটি করে ঘুমোচ্ছে কোল চিপকে। সেমিজের বাঁধন খুলে ঘুমন্ত ছেলের মুখে স্তন্য দিল বসুমতী। টানছে না। চুষছে না একবারও। নাড়াচাড়া করল ঘুমন্ত ছেলেকে। কী হল, আজ খায় না কেন ? অবাক লাগে বসুমতীর। অন্যদিন ঘুমের ঘোরে চোষে একটানা। এখন এমন করে কেন ? ঘুম ভাঙেনি। না ভাঙুক। চেঁচামেচি করলে এখন প্রাণ যাবে। কিন্তু চুষুক না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

আবার নাড়া দেয় বসুমতী। তবু নড়ে না। একী! একী হল রে! কাতরে উঠল অসহায়। প্রায় জোরেই বলল, ওগো!

ত্রস্তে দ্বিজেন বলল, কী হয়েছে ?

—দেখো।

—কী দেখব ?

—ও তো সে নয়!

—কী নয়!

—ও নয়।

—কী ?

তারপর গলা ছেড়ে উৎকণ্ঠিত বসুমতীর হাহাকার শোনা গেল বাঁশবনের স্যাঁতস্যাতে অন্ধকারে।

ও মাগো। ওকে আনো। ফিরিয়ে আনো। ও রয়ে গেছে।

দ্বিজেন শঙ্কায় বিধ্বস্ত। বলল, কী আনব ? কাকে ফিরিয়ে আনব ?

বসুমতী আর কিছুই বলতে পারল না। অন্ধকার বাঁশবনে আরো জোরে বিলাপ করে উঠল।

ত্রাসে পালিয়ে আসার সময় কী আনতে কী এনে ফেলেছে।

কোলে ছেলের ভেজানো পাশবালিশ। বসুমতী চিৎকার করে উঠতেই দ্বিজেন ওর মুখ চাপা দিয়ে তাকাল দূরে।

ওদিকে গোটা গ্রাম জ্বলছে তখন দাউদাউ। এগারো মাসের রাতুল রয়ে গেছে ওখানে। একা। বসুমতী মূর্ছা যায়।

দ্বিজেন উঠে দাঁড়ায়। দৌড়াতে শুরু করে নিজের ভদ্রাসনের দিকে। একফালি ক্ষীণ আশা বুকে—রাতুল এখনো আছে। ঘুমোচ্ছে হয়তো। পুবের আকাশে আলোর মিহিন বর্ণ ফুটছে। রাত অতিক্রান্ত হয়ে আরো একটা দিন আঁধার সরায়। এদিন কেমন, কেউ জানে না এখন।

মূর্ছিত বসুমতীর কোলে তখনো রাতুলের ভেজানো পাশবালিশ।

আর দ্বিজেন অনবরত ছুটছে গ্রামের দিকে। অনেক কিছু পুড়ে যাওয়ার গন্ধ বাতাসে, ধোঁয়ায়। দ্বিজেনের একই ভাবনা—রাতুল কী এখনো বেঁচে আছে? যদি জেগে যায় চেঁচাবে ভীষণ মাকে না পেয়ে। 'ঠাকুর, ওকে যেন পাই। ও যেন অক্ষত থাকে।' কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ছুটন্ত দ্বিজেন হাউহাউ করে কেঁদে উঠল খোলা মাঠে।

দ্বিজেন আরো জোরে দৌড়ায়। এতোদূর লাগে কেন গ্রামের সীমানা?

আকাশ জুড়ে ভাসছে কালো ধোঁয়া। জ্বলছে নিরিবিলি জনবসত। দ্বি-খণ্ডিত দেশের অতি তুচ্ছ এক ভূমিখণ্ড জ্বলে জ্বলে রাখ হয়ে যায় অনেক ভীত, সন্ত্রস্ত চোখের সামনে। দ্বিজেন প্রাণপণে দৌড়ায়। ওকে আনতেই হবে।

খিদে সহ্য করতে পারে না ছেলেটা একেবারে। জেগে উঠলে মুস্কিল। ভীষণ চেঁচাবে।

কয়েকটা ঘন্টা কেটে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। বাঁশবনে বসুমতী অচেতন। দ্বিজেন এখনো ফিরে আসেনি। কেবল মাথার উপর সূর্যের আলো। বাকি আকাশের সূর্যালোক ঢেকে দিয়েছে বসত পোড়ার কালো মলিন ধোঁয়া। কেউ কেউ আড়াল ছেড়ে বেরিয়েছে। বাঁ হাতের চেটো ভুরুর উপর আড়াআড়ি প্রসারিত করে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করছে নিজের নিজের বসত। কিংবা লক্ষ করছে—যে প্রিয়জন এখনো এল না, সে এই আসছে কী না। উঁচু আকাশের বাতাস ভর করে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া কেউ আসে না আপাতত।

ভবেন উঠে গেছে শ্যাওড়া গাছের পাশে। তারপর এগিয়ে গেল আরো সামনে। বারবার গ্রামের দিকে লক্ষ রেখে আরো এগিয়ে যায়।একসময় পৌঁছে যায় 'সঙ্কটা'র শ্মশানের কাছে। এদিক ওদিকে হেলে পড়া, কিছুটা উগলে যাওয়া সব কঞ্চি জড়ো করে উন্মাদ মায়ের শ্মশান আবার সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে। নরম মাটিতে শুকনো কঞ্চিগুলো পরপর গেঁথে দেয় যতটা পারা যায়। কিছু কঞ্চি ভেঙে যায়। সময় তো পেরিয়ে গেছে অনেক। এখন বেশ বেলা হয়েছে। সূর্য ঢল খায় পশ্চিমে বিশ্বাসদের বিশাল দিঘীর দিকে।

মূর্ছিত বসুমতীর কাছে ছেলে সহ দ্বিজেন এখনো ফিরে কেন যে এল না—বোঝা গেল না।

তিন

ভোর-ভোর সময়ে, যখন আকাশে অজস্র পাখির হুল্লোড় শুরু করেছে, তখন সীমান্তের স্টেশন সংলগ্ন গ্রামে তিনজনে মিলে পৌঁছে দিল।

জায়গাটার চারধারে টিলা টক্কর। ছোট ছোট পাহাড়, জঙ্গল। এ এলাকায় বানর খুব বেশি। বানরদের তেমন কোন শঙ্কা নেই। বাঘ টাঘ হলে অন্য কথা। তেমন হিংস্র জীবজন্তু নেই এখানে। কিছু হাতি আর কয়েকটা বাঘ আছে—এরা বানর মারে না। কারণ, পারলে তো মারবে? একলাফে গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে, সেখান থেকে মুখ ভ্যাংচানো। মানুষ বলো, বাঘ বলো, হাতি বলো—কেউ ভ্যাংচা ভেংচি সহ্য করতে পারে না। সুতরাং, বানর সবাই এড়িয়ে যায়।

কেবল একধরনের বড় চতুর আর হিংসুটে জন্তু ওদের মারে। সে তুমি যত আকাশ ছোঁয়া ডালে চড়ো না কেন।

লম্বাটে কী একটা ডালেরে মতো, এর ফোকরে কী একটা ঠুঁসে দেয়। আর ডালটা উপরে তুলে স্থির হয়। ডালের ডগায় বিকট শব্দ আর কালো ধোঁয়া। ডাল থেকে টপকে নিচে পড়ে যায় এক বানর—বয়স কত আর? কয়েক মাস।

একবার ওরা দেখেছিল আরো জঘন্য ব্যাপার। তিনজন লোককে মাত্র দুজন লোক, হাতে চকচকে লম্বা কী একটা দিয়ে আঘাত দিয়ে দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল।

স্নেহ ও আঘাতের ভাষা সবাই বোঝে। তাই, গাছে বসা বিভিন্ন বয়সের বানর দল স্পষ্ট বুঝল, এ হত্যা। ওরা শঙ্কিত হল, আমাদের মতো দু'পায়ে চলা জন্তু এমনভাবে মারে কেন? মারামারি, কামড়া কামড়ি আমরাও করি, কিন্তু একেবারে শুইয়ে দিই না? এরা তো প্রায় আমাদের মতোই। পুরোটা নয়, চেহারা ছবিতে আমাদের চেয়ে একটু বিশ্রী। কিন্তু আচরণ। হায়, হায়।

তেমনি পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ কয়েকজন বানর অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করল প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় একা দাঁড়িয়ে থাকা নলিনীকে। দেখল, এ প্রাণী তেমন নয়।
দুই একজন নেমে এল গাছ থেকে। দূরে দাঁড়াল।

তখন দিনের আলো পুরোপুরি ফুটেছে। নলিনী দেখছেন ওদের। জংলি বানর খামছে টামছে দেবে না তো?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওরা জিজ্ঞেস করল, এত ছন্নছাড়া হয়ে গেছ কেন তুমি, কী হয়েছে?

নলিনী বুঝল না। একটু তটস্থ হলেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়েই যে কুশল জিজ্ঞাসা করা যায়। বানরেরা এমনই করে। মানুষের মতো বানরের তো সুশ্রী মুখাবয়ব নেই যে, সুন্দর-স্মিত হেসেও কুটিল, কর্কশ ও নির্মম কথা বলবে।

এ এলাকায় কখনো অসেননি নলিনী এর আগে সুতরাং ভূগোল স্পষ্ট জানা নেই। ইতিহাস কিছুটা জানেন। খুবই ঐতিহ্যময় পাহাড়ি গ্রাম।

১৮৫৭-র মুক্তিকামী দলছুট কিছু 'নেটিভ' সৈনিকের রক্তে সিঞ্চিত হয়েছিল এই এলাকার মাটি। 'সিপাহি বিদ্রোহে'র তেজ যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, গোটা দেশ জুড়ে 'রিপ্রেসিভ

অ্যাকশনে'র নামে বীভৎস ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে গোরাপল্টন। সে সময় এই টিলা ও পাহাড়ের ঢালে মুখোমুখি লড়েছিল স্বাধীনচেতা নিঃস্ব, অবসন্ন, ক্ষুধায় কাতর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা। কেউ হার মানেনি। ধরা দেয়নি। যারা শহিদ হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন হিন্দু ও কয়েকজন মুসলমান ছিল।

বিষণ্ণ হয়ে যান, মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। তবু আশা বুকেই আবার পুঞ্জীভূত হয়—একদিন সব শান্ত হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে আগের মতো। না হলে কি আজ এভাবে নিজেদের প্রাণ হাতে নিয়ে বাচিত আলী এখানে পৌঁছে দিত! আশ্বাসও দিয়ে গেছে, একদম ঘাবড়াইয়েন না ডাক্তারবাবু, ওগোরে আমরা পার কইরা দিমু। খোদার দোয়া হইলে, এই পরেশানি আর কয়দিন?

—কী কন?

নলিনী বলছিলেন, আমার তাই মনে হয় বাচিত ভাই।

গত পরশু, সন্ধ্যার একটু আগে সদরের ডাক্তারখানায় এল বাচিত। বলছিল, ডাক্তারবাবু।

—কী ব্যাপার বাচিত ভাই? শরীর খারাপ?

বাচিতকে দেখে তেমনই মনে হয়েছিল নলিনীর। বলছিলেন, কী হয়েছে তোমার?

—আজ রাইতে পার কইরা দিতে হইব।

—কী পার করে দেবে?

—আপনেরে।

—কোথায় পার করে দেবে, কেনই বা পার করে দেবে?

বাচিত অনেকদিনের পরিচিত লোক। সেই ছোটবেলা থেকে। হাওরে-বিলে, বনে-বাদাড়ে সবাই মিলে ছোটাছুটি, দীঘিতে সাঁতার। শুকনোর সময় নদীর যখন জল কমে যায়, সাঁতার না কেটে হেঁটে হেঁটে নদী পেরুনো। বুক সমান জল শুধু। নদীর বিস্তীর্ণ বালুচরে 'কাফনা' (এক ধরনের শামুক) ভেঙে মুক্তোর দানা খোঁজা। কে যেন ওদের বলে দিয়েছিল, কাফনার পেটে মুক্তো পাওয়া যায়। এমন এক মুক্তো পেলে, এর বদলে পাওয়া যায় বিরাট এক সাম্রাজ্য—একেবারে রানি-টানি সহ। কিন্তু কোন কাফ্নায় এমন মুক্তো মিলবে, আর কোন খরিদ্দার এমন মুক্তো কিনবে এসবের ধারণা মোটেই নেই, তবু খুঁজে যাওয়া। কাফনা পেলেই ভাঙা, আর বাচিতের হতাশা, নাই রে নলিন্ নলিনী।

বালক নলিনীর আশ্বাস, আয় আয়, আরো খুঁজি। এক লক্ষ শামুক ভেঙে মাত্র একটার মধ্যেই পাওয়া যায় মুক্তো। খুঁজি চল।

সংখ্যার স্থানীয় মান পাঠশালায় শিখেছে দুজনে। কিন্তু সম্যক জ্ঞান তো নেই। এক লক্ষ সঠিক কতটা। ভাবে, মাত্র আরো কয়েকটা। সুতরাং খুঁজে বেড়ায় দুই সাম্রাজ্যলোভী বালক মুক্তোর দানা। আর ভাবে সোজা কথা। বাপরে! লোকলস্কর, হাতিঘোড়া, তোপবন্দুক, আর রানি। ছনের খলায় গিয়েছিল দু'জনে। প্রায়ই যায়। ঢোঁড়া সাপ দাঁত বসাল 'নলিনী'র গোড়ালিতে।

ত্বরিতে ওঝাগিরি করল বালক বাচিত।। গোড়ালিতে মুখ দিয়ে চুষে নিল রক্ত। কয়েকবার।

থু থু করে ফেলছে। রক্ত কালো নয়। বিষ নেই। তবু দোসরের জন্যে শঙ্কা। এভাবেই দিন যেতে যেতে নলিনী একদিন ডাক্তারবাবু আর বাচিত একদিন বাচিত ভাই। বাচিতের আব্বু মসজিদের খাদিম। কোনো পার্বণে 'তোষা' দিতেন নলিনীকে। শুধু ওকে কেন, অনেককেই।

বাচিত তেমন পড়াশোনার ধার ধারেনি। বলত, আমার মুক্তি নাই ডাক্তারবাবু। জলের তলায় মাছের খবর বুঝি বিলকুল। বাচিত মাছের সম্পন্ন কারবারী।

এই বাচিত যখন উৎকণ্ঠায় বলে নলিনীকে, তোমারই লোক লাগছে তোমার পিছে। এই ডামাডুলে সুযোগ লইতে চায় কত হেমান।

জেগা-জমিন বড় বেত্তমিজ, মাইনষেরে শয়তানের আউলাদ বানায়। সময় নাই। জানো তো, আমার খবর মিথ্যা হয় না।

বাচিতকে নির্ভর করতেই হয়। নলিনী জানেন, ওর কথা মানে পাথরের শরীরে খোদাই দাগ। বাচিত বলেছিল, বৌঠান, বরুণহারু, পারুলমাই-র কথা ভাইব না। আমি থাকতে তাগো গায়ের লুম কেউ ছুঁইবার পারবে না। আল্লার নামে কথা দিলাম। এক মুসলমান জান দিব, কথার খিলাফ করব না। ইনশা আল্লা।

নিজের হৃদপিন্ড যতটুকু আপন, ঠিক এতটুকুই আপন বাচিত আলী নলিনীর কাছে। তবু দুশ্চিন্তা, শঙ্কা থেকে যায়। বাচিত তো একা নয় সংসারে।

বাচিত নিজে সঙ্গে নেয় না, ফটিক সীমান্ত পার করিয়ে ফিরে গেল। বলে গেল, সময় সুযোগে ওদের পার কইরা দিমু। মাত্র কয়েকটা দিন। আবার দেখা হইব। খোদা হাফেজ। আল্লার দোয়া তোমার তরে রইল 'নলিন'।

ট্রেন ছুটছে তিন চার ঘন্টা। হয়তো পৌঁছে যাওয়া যাবে ঐ শহরে। যে শহরে পরিচিত বলে প্রদ্যুম্ন আর রজনী। প্রদ্যুম্ন সুরবালার সম্পর্কিত ভাই। আর রজনী বললে তো রায়ত। কিন্তু মা ওকে নিজের বুকের দুধ খাইয়েছিলেন। রজনীর মা যখন মারা যায় সে তখন শিশু। রজনী রায়ত নয়, একই স্তন্যের অংশীদার। দুই ভাই। স্তন্য ভ্রাতা। নলিনী স্থির করলেন, ওর কাছেই যাবেন সর্বাগ্রে। নলিনীল পরনে সিল্কটুইলের সাদা শার্ট। সাদা ধুতি। পায়ে চামড়ার কালো জুতো। গায়ে সাদা কোট। পারুল বলে 'ডাক্তারি কোট'। কোটের বাঁ পকেটে স্টেথো। ডান পকেটে রুমাল, কিছু নোট ও খুচরো মিলিয়ে মোট পেল টাকা তিন আনা। এই সম্বল। সামনে ভীষণ অনিশ্চিত এক ভবিষ্যত। ওদের পড়ে আছে কয়েক লক্ষের অস্থাবার, স্থাবর, আর প্রিয়জন।

জীবন কাকে কোথায়, কখন, কীভাবে ঠেলে দেবে, কেউ আঁচ করে না। করলে পৃথিবীর কোথাও কেউ কোনোদিন উৎখাত হত না। উৎখাত হতে হতেও আশা রেখে যায়, আবার স্বভূমিতে ফিরে আসবে। নলিনীর এমনি ভাবনা।

বন্যা, খরা, ঝড়, ঝঞ্ঝা, দাবানল, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্পে উচ্ছেদ মানুষের পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা থেকে যায়, কিন্তু মানুষ যখন মানুষকে উৎখাত করে, যারা ভিটেমাটিহীন হয় তারা সব মাত্রায়, সবদিক থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছিন্নমূল থেকে যায়। পৃথিবী জুড়ে এক ভূমিখণ্ডে থেকে 'এক্সোডাস' আবার অন্য আরো এক রাষ্ট্রের দিকে 'ইনফ্লাক্স'—এই নির্মম প্রক্রিয়া অব্যাহত

আছে সভ্যতার সূচনা থেকেই।

অবহেলিত বিরাট এক জনগোষ্ঠীর কপালে স্থায়ী আবাস নিবাসের নিশ্চিতি প্রায়ই থাকে না মুষ্টিমেয় কিছুলোকের বিবেকহীন ক্রিয়াকলাপ ও অমানবিক স্বার্থে। নলিনী এখন এমনই এক জনসমষ্টির অতি ক্ষুদ্র বিন্দু। এই বিন্দু সহ তিন কামরার ট্রেন ছোটে এক টারমিনাস স্টেশনের দিকে। গন্তব্য রজনীর বাসা ও প্রদ্যুম্নর খোঁজ খবর। ঐ শহরে আরও কয়েকজন পরিচিত থাকলেও থাকতে পারে। আপাতত জানা নেই, কে আছে এমন। এক নদীর পোল পেরিয়ে গেল ট্রেন। ছোট নদীটা, মিশেছে আরো এক বড় নদীতে।

চার

সুরবালা বললেন, কী হচ্ছে ? কোনো কাজ পাচ্ছিস না পারু ? একটা কিছু করবিই! কী করছিস ?

পারুলের নির্বিকার জবাব —কিচ্ছু না।

সুরবালা আরো বিরক্ত। বললেন—কিচ্ছু না মানে! হাতের কাছে যা পাচ্ছিস ফেলছিস এক এক করে। কেন করছিস ?

পারুল চুলের খোঁপা বাঁধল। শেষ রাতে সুরবালা ফিতেয় চুল বেঁধে দিয়েছিলেন। কখন খুলে ফেলেছে সে সব।

হারু বলল, ঠিকই, ফেলছিস কেন ? সব ফেলে দিবি ?

পারুলের একই রকম জবাব, হুঁ! তোরঙ টোরঙ সব কিছু। দরকার হলে তোকেও।

সুরবালা ধমকালেন, পারু।

পারু কোনোকিছুর গুরুত্ব দিল না। না সুরবালাকে, না হারুকে। হারুকে তো সে কিছুই মনে করে না, এমন আচরণ করে যখন তখন।

তবু হারু বলল, আমাকেও ফেলে দিবি, পেত্নি কোথাকার।

দীঘল চোখের শাণিত দৃষ্টিতে হারুকে প্রায় ফালাফালা করে দিয়ে নিতান্ত তাচ্ছিল্যে পারুল বলল, ধূর ভূত!

পারুল ও হারুর বয়সের পার্থক্য সাড়ে তিন বছর। সুরবালা জানেন, হারু হার মানে পারুলের কাছে। ধমক খেয়ে এবারেও চুপ করে গেল।

সুরবালা বললেন, তোরা থামবি। কেন ওর সাথে কথা বলিস হারু। বড় ছোট যে মেয়ে মানে না।

হারু খুব সাবধানে বলল, একদিন দাঁত ভাঙবে তোর। দজ্জালনী! খুব আস্তে হারু বলল শুনলে রক্ষে নেই। সব চুল-চামড়া ছিঁড়ে নেবে।

পারুল বলল, কী বলছিস রে ?

—কিচ্ছু না তো।

—একা একা কী বলছিস ? তোর মাথা খারাপ ?

[illegible]

যাবে আরো পরে। এ পথে আসা, পথকে সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে।

পারুল এবার ফেলল একটা চামচ। কেউ লক্ষ করল না। আবার কিছুটা এগিয়ে যেতেই ফেলে দিল ওর সংগৃহীত নুড়ির কয়েকটা। এবার সুরবালা লক্ষ করলেন। হারুও। অন্তত একশো গজ পেরিয়ে ফেলে দিল আরো দু-চারটে নুড়ি।

গাড়ি এগোয়। আরো কিছু পথ পেরুনোর পর এক খণ্ড পুরনো কাপড় ছুঁড়ে দিল পথের পাশে। বাতাসে উড়ে উড়ে বস্ত্রখন্ড আটকে গেল রাস্তার কিনারায় বুনো ঝোপে। হাওয়ায় লত্‌পত্‌ করতে থাকে। পারুল স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। গাড়ি এগিয়ে যায়। কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো বুকে ধরে বুনো ঝোপ অনেক পেছনে পড়ে থাকে। গাড়ি এগোয়।

হারু বলল এক সময়, কেন এমন করছিস পারু ?

পারুল চুপ। গাড়ি এদিক ওদিক দোল খেয়ে এগোয়। ওরা সবাই গাড়ির ভেতর দোল খায়। চেতনহীন মানুষের মতো অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন যামিনীর মাথা একদিকে এলিয়ে পড়ে। তবু ঘুমোয়। সুরবালা লক্ষ করছেন পেছনের গাড়ি আর বার বার দেখছেন, আকাশ, আকাশের সূর্য। বেলা গড়াতে আরো কত সময়। একটাই ভাবনা মাথায় মগজে—বর্ডার কখন পেরুনো যাবে। সন্ধের আগে এই খোলা উদোম প্রান্তর পেরুনো যাবে কিনা ? এ পথে তেমন চলে ফেরা নেই আজ। সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক সব। প্রয়োজনে রিয়াজ পীতাম্বর কুমুদ বসির জান লড়িয়ে দেবে ওদের, ডাক্তারবাবুর পরিবার পুত্রকন্যার জন্যে—এ ভরসা ভরপুর সুরবালার। তবু দিনকাল তেমন ঠিক নেই, বিরাট একদল এলে এরা কতক্ষণ। পর্বতপুর পৌঁছলে চিন্তা নেই। সেখান থেকে সীমান্ত ঘণ্টাখানেকের পথ। পারুর বাবা কি প্রদ্যুম্নের ওখানে উঠলেন ? কত যে চিন্তা মাথায়। হাতের একটা সবুজ কাঁচের চুড়ি খুলে ভাঙল পারুল। হারু সাহসে ভর করে হাল্কা ধমক দেয়।

—কী করছিস আবার ?

পারুল বলল —দেখছিস তো, চুড়ি ভাঙছি।

—কেন ভাঙছিস ? বাবা এনে দিয়েছিলেন। কেমন বায়না ধরেছিলি। অশ্বিনীকে পাঠিয়েছিলেন বাবা শুধু চুড়ি আনতে সদরে।

পারুল মুখ ভার করে। কঠিন স্বরে বলল, বাবার কথা বলবি না। তোদের বারার সাথে একটাও কথা বলব না। যেদিন দেখা হবে, তাকাবই না নলিনী ডাক্তারের দিকে।

—কেন ?

—আমাকে না বলে চলে গেলন কেন ? কী সাহস দেখো। আমাকে না বলে, কথা সম্পূর্ণ না করে পারুল একটুকরো ভাঙা চুড়ি ফেলে দিল পথে।

হারু বলল,—কী হচ্ছে এসব ?

—ভাঙা চুড়ির টুকরো ফেলব একটা একটা।

হারু অবাক, বলল, কী!

পারুলের আবার ভর্ৎসনা, ধুর ভোদাই, তোর মাথায় কিচ্ছু নেই, মেজদা।

মাথায় কিছু নেই যে মেজদা, অর্থাৎ হারু বুঝল আর প্রশ্ন করা নিরর্থক। উল্টে আরো বকা

খেতে হবে। একবার তাকাল কেবল সুরবালার দিকে। তারপর নিজেকেই যেন বলল ফিসফিসিয়ে,

তোর মাথায় সব ভালো জিনিস। আমার মাথায় খালি গোবর। বাবার আদরে নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে।

সুরবালা দেখছেন, শুনছেন সব। পারুল ভাঙাচুড়ির আরো কয়েক টুকরো ফেলল পেছনে পড়ে থাকা ধূলিময় পথে।

দেখতে দেখতে বিরক্তির স্বরে সুরবালা বললেন, কেন এমন ভাঙছিস সব ? কী হয়েছে তোর ?

একবার সুরবালা, একবার হারুর দিকে লক্ষ করে পথের দিকে তাকাল পারুল। দৃষ্টি কিছুটা উদাস ও অন্যমনস্ক। তারপর বলল, এসব ফেলে যাচ্ছি কেন জানো ?

সুরবালা ও হারু ওর দিকে নিষ্পলক। কোনো জবাব না পেয়ে পারুল বলল, আবার যখন ফিরে আসব, এই চিহ্নগুলো দেখে দেখেই পথ চিনতে হবে। না হলে ফিরব কী করে ? তোমরা কিচ্ছু বোঝো না। মেজদার মাথায় ফুটবল ছাড়া কিচ্ছু নেই। এখন বুঝলে তোমরা, কেন ভেঙে ভেঙে সব ফেলে দিচ্ছি পথের পাশে ?

তারপর বেশ জোরে রিয়াজকে জিজ্ঞেস করল, আর কতটা পথ গো রিয়াজকাকা ? আমার সব চুড়িতে পোষাবে তো ?

কাকভোরে বেরিয়েছিলেন তিন সন্তানসহ। যতটা না নিলে হয়, ঠিক ততটা সামগ্রী নিয়েছেন আর আঁচলে সেই চাবির গোছা। ঘরদোর সব খোলা আছে তবু পিঠে ঝুলছে আপাতত তাৎপর্যহীন পুরুষানুক্রমের চাবির গুচ্ছ। বেরুবার সময় লক্ষ করেছেন তুলসীবেদিতে তখনো জ্বল জ্বল করছিল পিলসুজের শান্তশিখা। এভাবেই আলোর শিখা জ্বালিয়ে রেখে চলে যাচ্ছে অগণিত মানুষ। এ শুধু নিছক পিলসুজ নয়। গৃহস্থ জ্বেলে দিয়ে এসেছে ক্ষীণ আশা, যদি আবার ফিরে আসা যায়। কথাগুলো এভাবে ভাবতেই কিছুটা স্বস্তি বোধ করেছিলেন সুরবালা। তেমনি মানবিক প্রত্যাশার আলো জ্বলছিল প্রাক ভোরের কৃষ্ণবর্ণ ঘন অন্ধকারে, নলিনী সুরবালা বরুণ হারু পারুলের স্নিগ্ধ নিবিড় ভদ্রাসনে।

পারুল জেদ ধরেছিল প্রথমে—সঙ্গে সরমা ও সরমার বাছুরকেও আনবে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ক্ষান্ত করা হয়েছিল। কিংবা বলা যায় নিজেই নিজেকেই হয়তো বুঝিয়েছে—থাকুক সরমা ওর ছেলে নিয়ে এখানে। পুতুদা, অশ্বনীকাকা দশরথ দাদু খুব যত্ন নেবে কিরে খেয়েছে।

সদর পেরুতেই সরমার পিছু ডাক শুনতে পেয়েছিল পারুল, সেই বিকৃত সংস্কৃত শব্দ—হাম্বা (অম্বা)। সরমার অম্বা (পারুল নিজেকে তাই মনে করত) একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে যেন বলে দিয়েছিল—আমি আবার আসব, কাঁদিস না।

চরণ কিছুই দেখেনি। সে তখন গাঢ় ঘুমে।

পারুলের অতিশয় সরব অথচ ভীষণ জটিল প্রশ্নের কী উত্তর দেবে, রিয়াজ খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রশ্নকর্ত্রী ও উত্তরদাতার কেউই এমন আভাসপূর্ণ ঘোলাটে পরিস্থিতিতে উপনীত হয়নি

কোনোদিন। বস্তুত, পারুর কথার নিগূঢ় অর্থ পারুল নিজে জানে না সঙ্গত কারণে। রিয়াজও কিছুই বোঝেনি গ্রামীণ সারল্যে।

তাই রিয়াজ বলল ভাসা ভাসা, না গো, আর বেশি পথ বাকি নাই। মগরবের আজানের লগে লগে পৌঁছাই দিমু, দেখবানে। হারু চুপচাপ তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। পারুল ভাঙা চুড়ির টুকরো ফেলছে ধুলোয়। কেবল সুরবালা শুকনো মাঠের খটখটে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নীরবে।

গোরুর গলার ঘন্টার ধ্বনি ও চাকার কর্কশ শব্দে বুক বিদীর্ণ সুরবালার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কেউ শুনল না তেমন আর।

পাঁচ

ক্যাম্প থেকে দক্ষিণে বেশ দূরে ছড়া (ছোট নদী)। এই নদীর পারে বয়ে আনা হল পারুলকে। ছড়ায় জল কম, হাঁটুও ডোবে না। লালচে মোটা বালু কোথাও কালচে রঙে রূপান্তরিত মাটি। যে মাটিতে মূর্তি গড়া হয়।

নদীর দূর-দূর অবধি লোকালয় নেই। ওপারে পাশাপাশি দুটো গাছ, চালতার। ডানদিকে একটু দূরে খুব উঁচু, শিমুল। পার থেকে অল্প দূরে অপেক্ষাকৃত উঁচু মাটির ঢালে একটা হিজল। কয়েকটা বাঁশঝাড়। সব গাছের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে শেষ শীতের হাওয়া। তবে বসন্ত এখনো আসেনি। কোকিল ডাকার কথা এ ঋতুতে—ডাক শোনা যায়নি। কোকিলেরা অন্য কোথাও হয়তো সরে গেছে।

সুরবালা কাঁদছেন অবিরাম। এখন ফিসফিসিয়ে। তিন সন্তানের মধ্যে পারুল সবচেয়ে ছোট। বয়স তেরো হয়নি এখনো।

কী প্রচণ্ড ছোটাছুটি করত সেই এগারো বারো মাস বয়স থেকে। ও বয়সেই হাঁটতে শিখেছিল। হামাগুড়ি দেওয়ার আগেই হাঁটা। দশরথের দুই তর্জনী কচিকচি আঙুলে শক্ত করে ধরে একপা-দুপা হাঁটত। মুখে খিলখিল হাসি। এমন হাঁটতে হাঁটতেই দু-একদিনে হাঁটা শিখে নিল। তারপর ওকে সামলায় কে ? তখন সরমাও ছোট্ট। (সরমা পারুলের সই, ধবলী সবে জন্ম দিয়েছে ওকে)। দুটোই মিলে উঠোনে দাপাদাপি। একদিনে ছোট্ট সরমা খোঁচা দেয়নি আবোল তাবোল অস্থির পারুলকে।

ছ-সাত বছর বয়সে সাঁতার শিখেছিল পারুল। তখন সরমা পুরোপুরি ধীর স্থির। ডাগর গভীর দুচোখে কিছুটা স্নেহ পরবশ, দামাল পারুলের কর্মকাণ্ড লক্ষ করে কেবল। মাঝে মাঝে ডাকে সইকে—'হাম্বা'। তখন হয়তো পারুলের জবাব—'রাখ আসছি। অনেক গল্প হবে।' এই তো মাত্র কদিন আগে নলিনীকে বলেছিল পারুল, জানো বাবা ?

—আবার কী হল ?

—আমাদের সরমা সংস্কৃত জানে।

—কী !

—হ্যাঁগো।

—সংস্কৃত জানে সরমা ? তোর মাথায় কখন যে কী হয় ?

—ধুর! সরমার ডাক শোনোনি ?

—কেন শুনব না ?

—না শোনোনি। একটু উল্টোপাল্টা হলেও পরিষ্কার সংস্কৃত বলে।

নলিনী জানেন, মেয়েটা মেধাবী। কিন্তু গোরুর ডাকে সংস্কৃত কোথায় খুঁজে পেল ? বললেন, তোর কথা শুনলে সবাই ক্ষেপে যাবে।

—কেন ?

—গোরু কখনো সংস্কৃত বলে ?

—বলবে না কেন ? সব গোরু প্রায় স্পষ্ট সংস্কৃত বলে। ডাক শোনো না কেন ? পুরুতদের কান কোথায় ?

—কেমন ডাক গো পারুল রানি ?

পারুল দৃঢ় প্রত্যয়ে দরাজ স্বরে বলে, হাম্বা।

নলিনী বিস্ময়ে। বললেন, হাম্বা। এখানে সংস্কৃত কোথায় ?

পারুল তখন ধ্বনি-বিশেষজ্ঞ। বলল, 'অ' উচ্চারণ করতে পারে না হয়তো। গোরু তো। না হলে অম্বা আর হাম্বায় কী তফাৎ ? সব গোরু মা-মা-না বলে হাম্বা বলে। তুমি কিচ্ছু জানো না। কী করে ডাক্তারি পড়লে ?

বাপ-বেটির সব কথা শুনছিলেন সুরবালা। সেদিন বলেছিলেন, তুই সংস্কৃত জানিস পারু ? কোথায় শিখলি ? গাঁদা গাছ থেকে বাঁশের কাঠি দিয়ে কয়েকটা ক্ষুদে বিছে ঝাড়তে ঝাড়তে পারুল বলল, ঠানদি রোজ কী পড়েন, তুমি শোনো না ? ঠানদির কাছে সংস্কৃত শিখছি। সামনের বছর সংস্কৃত আছে। পুরো একশো নম্বরের বিষয়। তারপর জোরে নলিনীকে বলেছিল, বাবা।

নলিনীর বিনীত জবাব, আজ্ঞে ?

—সদরে কবে যাবে অষুধ আনতে ?

—যাব চার পাঁচ দিন বাদে। কেন, কোনো হুকুম ভিক্টোরিয়া রানি ? আদেশ করুন।

—একটা ইংরেজি বর্ণবোধের বই এনো।

—কেন ? তুই তো ভালো ইংলিশ জানিস গো মহারানি।

—আমার না। সরমার জন্যে। পুতুদার জন্যে। দুজনকে এ বি সি ডি শেখাব। পুতুদার আগে সরমা শিখে নেবে, আমি জানি।

পুতু আশেপাশে ছিল না। থাকলে নির্ঘাৎ অভিযোগ করত, ঠাকুরাইন। আমি কী গোরুর চেয়েও কম ? এঁ-এঁ-এঁ। পুতুর ন্যাকা কান্না আর পারুলের হাসিতে রমরম করত বিস্তৃত উঠোন। পারুল তোলপাড় করত অন্দর বাড়ির দিঘীর জল। বয়সের তুলনায় বেশি লম্বা, ছিপছিপে, বর্ষার লতার মতো। মুখশ্রী, অন্তত পঞ্চাশ জনের ভিড়েও ওর মুখেই সবার দৃষ্টি আগে যায়। সারা মুখে দুষ্টুমি, সৌন্দর্য, জেদ, কমনীয়তা সব মিশে আছে—যেমন ফুলের সাথে মিলে যায় সৌরভ

ও নির্যাস। কিছু না কিছু অনবরত চিবোচ্ছে। মুখে একটা কিছু থাকবেই, আর কথার বকবকানি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তো আছেই। হয়তো চিবোচ্ছে কাঁচা বাদাম, কখনো মটরশুঁটির শুকনো দানা, কাঁচা আম, সপরি, করইভাজা (সেদ্ধচাল ভাজা), আমসত্ব। মুখের বিরাম নেই। যত অনীহা ভাতে। পাখির চেয়েও কম, দু-চার দানা জোরজার করে। মাছের পেটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে—ধেঁৎ, এতে ক্যাতক্যাতে তেল, ছিঃ।

দুধ দু-চোখে দেখতে পারে না। কাঁসার গ্লাসে দুধ দিত যামিনী। দিতেই তুমুল হল্লা, না খাব না।

—কেন খাবে না গো দিদিমণি! —ধুর, খাব না, ভাগ!

—একটু খেয়ে নাও। বড়মা দিলেন।

—তোর বড়মাকে খাওয়া।

বড়মা, অর্থাৎ, নিজের মা সুরবালা, কাজের মেয়ে যামিনীর বড়মা। হাতের নানা কাজে ব্যস্ত সুরবালা তখন হয়তো বলতেন, কেন খাবি নারে ধিঙি মেয়ে! সারাদিন বাঁদরামি। শরীর পাটকাঠি হচ্ছে দিন দিন। দুপুরে একমুঠও ভাত খাসনি। খেয়ে নে তাড়াতাড়ি।

—খাবো না বললাম যে।

তখন পারুলের মুখে লঙ্কা নুন মাখা শুকনো কুল বিচি, চুষছে। জিভে শব্দ চকাস্ চকাস্। সুরবালার আবার অনুশাসন ও অনুনয়, লক্ষ্মী মেয়ে। খেয়ে নে। না হলে জোর করে...

কথা শেষ হতে না হতেই পারুল বলল, কতবার বলব ? খাব না এক ফোঁটাও।

—কেন খাবি না ? অবাধ্য মেয়ে কোথাকার।

—কতদিন বলেছি, দুধে গন্ধ গো !

—দুধে তো দুধের গন্ধ থাকবেই।

—দুধের গন্ধ না, বাজে গন্ধ !

—বাজে গন্ধ ?

—হুঁ।

—কীসের গন্ধ রে নবাবনী ?

—গোরুর শরীরের গন্ধ থাকে দুধে।

—গোরুর শরীরের গন্ধ! পাগল নাকি মেয়েটা।

—হ্যাঁ গো হারুর মা। সরমার শরীরের গন্ধটা ভালো নয়। তাই তো তোমার জবাকুসুম মেখে দিই ওর সারা গায়ে।

সুরবালা বিস্ময়ে বিমূঢ়। বললেন, কী ?

—হ্যাঁগো বউঠান, সারাদিন মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায় তো। অশ্বিনীকাকা চান করিয়ে তেল তো দেয় না। আমি সময় পেলে মেখে দিই। দেখনি লোমগুলো কেমন চকচক করে। পিঠের গোঁজ কাঁপায় আরামে। শরীরের গোরু-গোরু গন্ধ কিছুটা কমেছে।

সুরবালা বিধ্বস্ত। হয়তো বললেন, আমার তেলের শিশি কী করে যে খালি হয়ে যায় এবার

বোঝা গেল। তুই কীরে পারু ? শুনলি যামিনী ?

সুরবালা বিস্মিত ও বিরক্ত হতেন আরো। মা ও মেয়ের বিতন্ডার মাঝখানে দুধের গ্লাস হাতে হতভম্ব যামিনী ভেবে কুল পেত না—কী করবে।

পারুল লম্বা উঠোনের নন্দাই কোঠায় (এক ধরনের গ্রামীণ খেলা) এক পা তুলে লাফাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে ধাতুর একটা চাকতি তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে অন্য কোঠায়। কচি সুরেলা গলায় এক নাগাড়ে শব্দ, কিত্ কিত্ কিত্ কিত্।

—রেখে দে গ্লাস। খাবে না তো, না খাক। আহ্লাদী মেয়ে!

এই পারুল এখন চারজন মানুষের কাঁধে বাহিত হয়ে পৌঁছেছে ছড়ার পারে নিষ্প্রাণ। শেষ রাতে ওলাওঠায় মারা গেছে।

জায়গাটাকে কী শ্মশান বলা যায় ? যায়। কারণ, সমস্ত অঞ্চল জুড়ে, সব জনবসত, লোকালয়, সবকিছুর একটাই পরিচয়—শ্মশান। শ্মশান বলে আলাদা পরিসর খুঁজে নিতে হয় না। দেখতে দেখতে সব বিষাক্ত হয়ে গেছে। হত্যা, লুণ্ঠন, আগুন, ধর্ষণ ছাড়া আর কোনো খবর নেই কোথাও। মেঘনার পুলে রেল গাড়ি থামিয়ে নির্বিচারে হত্যা করছে নিরীহ লোকজনকে হামলাকারীরা। কেটে কেটে পুল থেকে মেঘনার জলে ফেলে দিয়েছে খণ্ডিত দেহ। রক্তে লাল। চুঁইয়ে পড়ছে রেলের বগি থেকে মানুষের শান্তিপ্রিয় রক্ত। এমনি অবস্থায় পাশবিকতার সাক্ষী হয়ে ট্রেন ঢুকেছে নিকটবর্তী রেলস্টেশনে। কে যে চালিয়ে আনল সেটাই বিস্ময়।

এসব খবর লোকমুখে দাবানলের মতো ছিতরে পড়েছে সবদিকে। মানুষের ভূমি-খণ্ড যখন মানুষই শ্মশান বানায়, তখন সজ্জিত শ্মশানের আর প্রয়োজন থাকে না।
তবু, এক চিলতে জলধারার বড় প্রয়োজন শ্মশানের পাশে। চিতা ঠান্ডা করতে জল চাই। প্রচুর জল। জলের প্রয়োজনেই পারুলকে ক্যাম্প থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই ছড়ার পারে বয়ে আনা হল। জোর করে সুরবালাও এসেছেন। দুই ভাই বরুণ হারু এসেছে। সঙ্গে আরো চার পাঁচজন শ্মশানবন্ধু। আশপাশের বনবাদাড় থেকে শুকনো ডালপালা, পাতা জড়ো করেছে ওরা।

তেরো বছরের একদা ছটফটে বালিকাকে দাহ করতে কতটুকুই বা জ্বালানী লাগে। চিতা সাজানো হয়েছে। ছড়া থেকে জল এনে পারুলের নিষ্প্রাণ দেহটাকে শেষ স্নান করানো হল। বিধিমতো তেমন কোনো উপাচার আনা হয়নি, কারণ সংগ্রহ করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতেও সুরবালা ভোলেননি, একটু ঘি, বহু পুরাতন একখণ্ড খুদে চন্দনকাষ্ঠ এনেছেন। ধবধবে সাদা পাটভাঙা ধোয়া জামাও সঙ্গে আনতে ভোলেননি সুরবালা। পারুলের গলায় চিকন সোনার হার খুলতে দিলেন না। বললেন, বসে যাওয়া স্বরে—না থাক। ওটা ওর খুব প্রিয় হার। খুলো না কেউ।

হার রয়ে গেল পারুলের গলায়। ভেজা চুল আঁচড়ানো গেল না। বরুণ হাত দিয়ে গুছিয়ে দিল। চুল বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল পড়ছে টপটপ। মুখ একটু খোলা। শুকনো দুটো ঠোঁট হলুদবর্ণ। শ্মশানবন্ধু সমস্বরে বলে উঠে—'হরি বোল'! পারুলকে ডালপালার স্তূপে তোলা হল এইমাত্র। থাক্ থাক্ গাছের শুকনো ডাল, পাতায় সাজানো হল সৎকারের সংক্ষিপ্ত উপাচার। এ সবের

আড়ালে পারুলকে আর দেখা যায় না।

মুখাগ্নি কে করবে ? নলিনী কিছুদিন আগে চলে গেছেন ওদেশে।

মুখাগ্নি হল না। আগুন দিতেই মর্-মর্ শব্দে দাউ দাউ জ্বলে উঠল ডালপালা আর পারুলের দেহ। প্রবাহিত বাতাসে আগুন আরো জোর পেল।

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস্য স্থৈর্যে সব দেখলেন সুরবালা। একটু আগেও চিৎকার করে কেঁদেছেন, যখন শ্মশানবন্ধুরা হরি ধ্বনি দিচ্ছিল।

এখন চোখে, গালে জল গড়ায় ফোঁটা ফোঁটা নিঃশব্দে। বুকে জ্বলছে আরো এক চিতা। আর এরই আগুন আবার মনে করিয়ে দিল—ভদ্রাসন ছাড়ার আগের দিন সন্ধ্যায় তুলসী বেদিতে যখন শেষ আলো দিচ্ছিলেন, তখন পারুল জিজ্ঞেস করেছিল, 'পিলসুজে আজ এত্তো তেল কেন', কিংবা, 'আমারা আর ফিরে আসব না মা ?'

গাড়ির ছইয়ের তলায় বসে ভাঙা চুড়ি ফেলে পথের চিহ্ন রেখে আসা পিছনে! এসব মনে পড়তেই মাটিতে বসে পড়লেন সুরবালা বিচলিত হয়ে। মুচড়ে উঠল বুক। নিদারুণ যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলেন, নারে মা, সবাই ফিরলেও তুই আর ফিরবি না কোনোদিন।

বরুণ হারু বসেছিল সুরবালার পাশে। ওদের চোখে জল। কেউ কোনো কথা বলে না।

বরুণ হারু সুরবালার ফিস্‌ফিস্ কান্নার শব্দ, একটানা বাতাসের প্রবাহ, কয়েকটা পাখির লক্ষবিহীন কলরব আর পারুলের চিতার আগুনে সবকিছু দগ্ধ হওয়ার শব্দ ছাড়া আপাতত আর কোনো ধ্বনি নেই এখন।

এক বালিকার শেষকৃত্যের আগুন জ্বলে অবিরাম। ঘর নেই, ঘাট নেই, আগামী দিনগুলোর নিশ্চিত স্থিতি নেই—নিজের মুষ্টিমেয় প্রিয়জনের চোখের সামনে নন্দাইকোঠায় কিত্ কিত্ খেলা করা দুরন্ত পারুল মুছে যায় চিরতরে। সুরবালা চেয়ে থাকেন অপলক।

একসময় বরুণ বলল, মা ওঠো। চলো তোমায় রেখে আসি ক্যাম্পে। আমাকে আবার আসতে হবে এখানে। আরো কাজ বাকি আছে।

কিছু সময় কোনো জবাব না দিয়ে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে সুরবালা বললেন, আমিও কয়েক কলস জল দেব রে!

—কোথায় জল দেবে তুমি ?

আঙুল তুলে সুরবালা দেখালেন, ওখানে, আবার কোথায় ? গরম শ্মশান ফেলে রেখে ফিরে যেতে নেই। মৃতের কষ্ট হয়। পারু কষ্ট পাবে।

কথাগুলো ঠিক কথা নয়। মর্মভেদী বিলাপের মতো শোনাল।

অস্থির হাওয়ার দাপট সুরবালার হাহাকার তুলে নিলো নিজের শরীরে। ছুটে গেল দিকবিদিক। কোথায় গেল, কে জানে !

বরুণ আবার বলল, না না। তুমি চলো। এসব তোমার কাজ নয়।

সুরবালা অবুঝ আপত্তি করলেন, যাব না বলছি যে। মুখাগ্নি হল না। এ-কাজটা অন্তত তোরা করতে দে আমায়। আমি মা হই ওর।

উঠলেন সুরবালা। বললেন, কলসটা দে তো। জল তুলে আনি ছড়া থেকে।

বরুণ শান্ত করার চেষ্টা করল সুরবালাকে। বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। জল দিও তুমি। আমরা তুলে এনে দেব। তুমি বসো না গো হারুর কাছে।

—না রে, দে না। আমি আনি। জল বড় ভালোবাসতো। তোলপাড় করত অন্দর-বাইরের দুটো দীঘি। তুই তো কতবার বকেছিস। জোর করে তুলে আনতিস জল থেকে, তোর মনে নেই ? দে, কলসটা দে।

সুরবালার গলায় শোকাচ্ছন্নতার অবসাদ। আবার বললেন, গরম একেবারে সইতে পারে না। দে, কলস দে। ঠান্ডা জল তুলে আনি।

কোনো আপত্তি গ্রাহ্য না করে মাটির কলস হাতে একমনে আরো কী কী বলতে বলতে সুরবালা নেমে গেলেন ছড়ার ঢালে।

বরুণ হারু চেয়ে রইল ওর দিকে পলকহীন। উনি ততক্ষণে ছড়ার জলের একেবারে ধারে। কয়েকটা ফিঙে ওড়াউড়ি করছে ওপারে হিজল গাছের মাথায়।

চিতা জ্বলছে। শুকনো ডালপালা পুড়ে যাওয়ার শব্দ, ছড়ার শীর্ণধারায় সন্তর্পণে কলসে জলভরার কলকল-ধ্বনি। সুরবালার আবার কেঁদে ওঠার শব্দ, সব শব্দ সংক্রামিত হল হারুর বুকে। স্নান করানোর সময় অ-খেয়ালে ভেঙে যাওয়া পারুলের শেষ একগাছি চুড়ির খণ্ড-বিখণ্ড পড়েছিল ভেজা মাটিতে। সেদিকেই একমনে তাকাতে তাকাতে বিপন্ন হয়ে গেল হারু।

প্রান্তর কাঁপিয়ে বুক চাপড়ে চিৎকার করে ওঠে সহসা, পারুরে, ও পারু, ফিরে আয়। রঙিন চুড়ি এনে দেব তোকে চড়কের মেলা থেকে। ফিরে আয় রে তুই...।

আরো কী কী বলতে চেয়েছিল। সব কথা স্পষ্ট হল না। আছড়ে পড়ল মাটিতে।

এদিকে আগুন জ্বলছে অবিরাম। পারুল প্রায় ছাই হয়ে গেছে। আর সুরবালা তখনো একমনে বিড়বিড় করতে করতে, জলভরা কলসি কাঁখে, ছড়ার ঢাল বেয়ে উঠে আসছেন।
চিতা শীতল করতে হবে তো!

ছয়

মলিন পিতলরঙা একফালি চাঁদ পশ্চিম আকাশে। এ আলোয় জ্যোৎস্না কম। এক ধরনের অলৌকিক মালিন্য বেশি। রাত হয়েছে বেশ আগে, দুধে সর পড়ার মতোন সারা আকাশ জুড়ে মেঘের পাতলা আস্তর—চাঁদকে বিবর্ণ করেছে আরো।

শাবাজপুরে রজনীর বাড়ির উঠোনে হাতল দেওয়া কাঠের চেয়ারে বসে আছেন নলিনী। আশেপাশে গাছগাছালি বিস্তর। আধো জ্যোৎস্নায় সব এখন কালো কালো। কী গাছ চেনা যায় না এই আলোয়। বাঁদিকে ঝাঁকড়া জামরুল গাছের কোনো এক ডালে বসা এক পাখির বুকের মধ্যে শিরশির অনুরণন তোলা ডাক—নিম্ নিম্ নিম্।

নলিনীর মন আরো ভারাক্রান্ত হয়। ভাবলেন—ওরা কি রওয়ানা দিল ? প্রদোষ-জলিলরা কি খবর দেয়নি ? এই ডামাডোলেও সুরবালার গোছগাছ শেষ হবে না জানা কথা। মেঘনার

পোলের উপর ঘটনার কথা শোনার পর থেকে মন আরো অস্থির। যত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে আসে ওরা ততই মঙ্গল। পড়ে থাক সবকিছু। আবার দিন ফিরলে সব করা যাবে একে একে। বসতবাড়ি তো আর উড়ে যাবে না। দিন কি এমন থাকবে সবসময় ? এবার ফিরে গিয়ে বাড়ির ডাক্তারখানার জন্য আরো দুটে বেঞ্চ বানাতে হবে। বড় ভীড় হয়। রোদে দাঁড়াতে হয় অনেক রোগীকে। সব করা যাবে। সব। জীবনটা তো বাঁচুক আগে। এই উন্মাদ ক্রিয়াকলাপ চিরটাকাল কি এমনি থাকবে। একদিন সৎবুদ্ধির উদয় হবে ঠিকই। নলিনী বসে আছেন একা। রজনীর বউ জবা রান্না বসিয়েছে রাতের। ওখান থেকে তেল ব্যঞ্জনের ছোঁক ছোঁক শব্দ আসছে। জবা কাজে খুব পটু।

রজনী গেছে বাজারে। কী কী আনতে গেল যেন। বলে গেছে, কাকাবাবু, সারাদিন খাটনি কম গেল না! সেই ভোরে বেরিয়েছিলেন। আপনি জিরান। আরাম করুন। আমি যাব আর আসব। নিতাই বাজারে অপেক্ষা করবে।

সেই যে গেল—ঘন্টা তো পেরিয়ে গেছে কখন। এখনো ফেরার নাম নেই।

রজনীর দুই ছেলে, এক মেয়ে। ঘরের ভেতর থেকে ওদের পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। পড়ার চেয়ে কলবলানি বেশি।

মেয়েটা পারুলের বয়েসি বোধহয়, ভাবলেন নলিনী। তবে পারুলের মতো লম্বা নয়। পারুল তো ওর মাকে প্রায় ছাড়িয়ে গেছে।

মেয়েটা কী করছে—কে জানে। বাপ আহ্লাদী মেয়ে—ওর মা বলেন। যত আব্দার-আদায় বাবার কাছে।

একবার মলিন হাসলেন নলিনী একমনে। শরীরটা ঠিক আছে তো ওর ? নলিনীর মাথা মগজ চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত হয় সাময়িক।

চলে আসার সময় একবার দেখাও করা গেল না। খুব রাগারাগি, কান্নাকাটি করেছে নির্ঘাৎ। আবার দেখা যখন হবে, তখন কিছু সময় কথাই বলবে না।

তাজমহল বানাতে দূর থেকে পাথর এনেছিল বুঝি ?

—ধ্যাৎ! তো কী বলছি, এই ডাক্তার।

রোগীর বুকের বাঁদিকে স্টেথো বোলাতে বোলাতে নলিনী বললেন, নেহাত বলতে হয় এমন, জানি না তো।

—তুমি জানো না ? ডাক্তার হয়েও জানো না ? স্কুলে কী করতে ? কী করে ইস্কুল পাশ করলে।

ডাক্তারের পাথরের খবরে কী কাজ রে ফুলটুসি (আদরের ডাক), তুই যা তো ভেতরে। হারুকে বল। ও বলে দেবে।

—কে, মেজদা ?

—হুঁ।

—হারু কিছু জানে না। মাঠ বল আর লাথালাথি। বলের ভিতর কী থাকে জানো ? হাওয়া।

মেজদার মাথাও তাই। নিরক্ষরেখা কোথায় তাও বলতে পারেনি সেদিন। তুমি নিরক্ষরেখা দেখেছ বাবা ? বড় বলছিল, ওটা নাকি কোথাও নেই। এমনি হিসেবের জন্য বলা হয়। কী হিসেব বলো না।

নলিনী ক্ষীণ স্বরে বললেন, উফ্!

পারুলের একতরফা জেদ, আমি নিরক্ষরেখা দেখব বাবা। ওটা কোথায় ? পৃথিবীর ঠিক মাঝামাঝি পেটে নাকি আছে ?

—হ্যাঁ আছে।

এবার রোগীর পেটে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল পারুল, ওর পেটেও নিরক্ষরেখা আছে ?

খোঁচার সুড়সুড়িতে শরীর কুঁচকিয়ে একটু হেসে অবসন্ন রোগীও বলল, কইয়া দেন না ডাক্তারবাবু কই আছে ঐটা। আমার তো জানা নাই। জানলে কইয়া দিতাম।

নিজের মেয়েকে এভাবে না বলে চলে আসতে হয় ? কী করে ডাক্তারি পড়লে তুমি ? কোনো বুদ্ধিটুদ্ধি নেই।

আবার স্মিত হাসলেন নলিনী। হাসি মিলিয়ে যায়। বিমর্ষ হন আবার। চাঁদের পাশে তখন নিরর্থক একখণ্ড মেঘ। আকাশে বিবর্ণ জ্যোৎস্না। রাত বাড়ে।

নলিনী ভাবছেন—দিনরাত এত লাফালাফি মেয়েটার। দীঘির জলে ঝাঁপঝোপ। সুরবালার বকাঝকা কিচ্ছু আমল দেয় না। শাসনের ছুতোয় বড় ভাইয়েরা ধরলেই, কব্জিতে দাঁতের কামড় বসিয়ে দে দৌড়। হারুকে তো অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে।

এবার বিষণ্ণ হাসি খেলে যায় নলিনীর চোখেমুখে। খাওয়া দাওয়া কম করে। নিজে পরীক্ষা করেছেন কয়েকবার। ঢাকায় বড় ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা করিয়েছেন। একফোঁটাও রোগভোগ নেই শরীরে। থাকবেই বা কেন ? থাকলে কেউ কি পারে ষোলো-সতেরো ঘন্টা একনাগাড়ে ছোটাছুটি করতে ?

এত দামাল হল কী করে ? বরুণ হারু তো তেমন নয়। বরুণ তো ধীর, শান্ত। আর প্রশ্ন! উফ্! প্রশ্নের তোড়ে অস্থির করে দেয় মেয়েটা। কত আর উত্তর দেওয়া যায়! কত যে প্রশ্ন!

—বাবা, রক্তের রং লাল কেন ? আমরা কেউ কালো আবার কেউ ফর্সা কেন ? কাঁঠালের রস মিঠে, তেঁতুলের রস টক, উচ্ছের রস তেতো কেন ? নারকেলের শক্ত খোলে জল কী করে ঢোকে ? হায়রে! এসবের গুছিয়ে কি জবাব দেওয়া যায় সবসময় ?

ঐ তো সেদিন দৌড়ে ঝড়ের মতো এল বাড়ির ডাক্তারখানায়। তখনো চার পাঁচজন রোগী বসে আছে। ইতিহাস বা এ জাতীয় কিছু একটা বই পারুলের হাতে। সোজাসুজি বাবার সামনে। তারপর প্রশ্নের তীক্ষ্ণ তীর, ডাক্তারবাবু!

—বলুন ?

—শোনো না।

—বলো না ?

—না, তাকাও। শোনো।

নলিনী তখন স্টেথো বার করছেন টেবিলে চিৎ হয়ে শোয়া রোগীর বুকে। অন্যমনস্ক জবাব দিলেন, আবার কী হল ? বলো না, শুনছি তো।

—না, শুনছ না। তাকাও আমার দিকে।

—কাজ করছি রে, বল তুই। শুনছি তো।

পারুল হঠাৎ নিবিড় গলায়, কৈশোর সুলভ অনুসন্ধিৎসায় বলল, বাবা গো, ও বাবা।

—বল।

—তাজমহল বানাতে এত দূর থেকে পাথর বয়ে আনার কি দরকার ছিল ? আমাদের দেশেই তো আছে, অনেক।

—কোথায় ?

—বিলের ধারে পুরোনো টিলার তলায় কত্তো সুন্দর সুন্দর ছোট বড় পাথর আছে। আগ্রা কি খুব দূর বাবা ?

রোগীর কথার গুরুত্ব না দিয়ে নলিনী একটু কঠিন স্বরে বললেন, তুই ভেতরে যা তো। এভাবে খোঁচাখুচি করছিস কেন ওকে। ওর গায়ে জ্বর জানিস ?

রোগীর কপালে হাত দিয়ে পারুল আহ্লাদ করে বলল জ্বর টর কিছু নাই। মাছের মতো ঠান্ডা কপাল গাল সব।

রোগী, অর্থাৎ ভজন, বিরস মুখে বলল, না গো ছোট ঠাকরুণ, গায়ে গতরে বিষ। জ্বর গো।

বাইরের ঘরে আরো রোগী। এদিকে পারুল অস্থির করে তুলছে। ডাক্তার-রোগী কেউ বাদ যাচ্ছে না। বললেন অনুনয়ে, তুই এখন যা।

—না, বসব এখানে। নিরক্ষরেখা কোথায় আগে বলো।

হয়ে গোল আর কি। একবার মাথায় কিছু চাপলে হয়। এখন ঐ রেখা চেপেছে।

নলিনী আবার বললেন, দোহাই তোর, ভেতরে যা। তোর জ্বালায় সব রোগী পালাবে।

পারুল তখন এ ঘর ছেড়ে ডাক্তারখানার নলিনীর চেয়ারে বসেছে। তিনদিকে আলমারি। টেবিলে আরো ঔষধপত্র। কত সামগ্রী। সামনে অধীর মুখে গোটা পনেরো রোগী, স্ত্রীলোকও আছে। কোণায় বড় টেবিলে তারক, নলিনীর হাতে গড়াপেটা কম্পাউন্ডার, পারুলের দিকে একবার দেখেই চোখ নামাল। মাথার ঠিক নেই মেয়েটার। জিজ্ঞেস করে বসবে, তারক কাকা, সোডি বাইকার্ব কতটা সোডা দিয়ে হয় গো ?

সঠিক বললেও খুঁত একটা খুঁজে বার করবেই। তারপর কাপড়চোপড়ে লেজে গোবরে এক করবে এতোগুলো লোকের সামনে। মান সম্মান বলে আর কিচ্ছু রাখবে না।

অবশ্য এ মুহূর্তে তারক কম্পাউন্ডারকে একেবারেই গুরুত্ব দিল না পারুল। বাপ-মেয়ের বার্তালাপ শুনছিল গ্রামের মানুষ, তেমন লেখাপড়া নেই ওদের। পারুলের নিরক্ষরেখার কোন ধারণাই নেই ওদের। কোনো কথা বুঝছিল না। কেবল এটুকুই ধরতে পেরেছে—ডাক্তারবাবুর গাছ বাওয়া মেয়ে কিছু একটা দেখতে চায়।

আগের রোগীকে ছেড়ে নলিনী এলেন এঘরে। বললেন, ওঠ্, আমার চেয়ার ছাড়। ভেতরে যা।

পারুলের আবার জেদ। যাব না ভেতরে। আগে বলো, দেখেছ ?

—কী ?

—ধুর! কী আবার ? নিরক্ষরেখা ?

—তুই যা তো। কাজ করতে দে। তোর জ্বালায় কেউ আর আসবে না এখানে।

পারুলের একই কথা, আমিও দেখব বাবা।

—কি দেখবি, রোগী ?

—না না। তাজমহল আর নিরক্ষরেখা।

—আচ্ছা হবে। এখন যা।

—আগে বলো, দেখাবে ?

নলিনী কী আর করেন। বললেন, হবে, সব হবে।

—কবে হবে ?

—নিরক্ষরেখা তো অনেক দূর। হাতে সময় নিয়ে যেতে হবে।

—আর তাজমহল। ওটা দেখব না ? নিরক্ষরেখা থেকে কত দূরে ?

—বরুণ জানে। ও বলে দেবে। আমায় রক্ষে কর।

কখন যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জবা খেয়াল হয়নি। মথায় ঘোমটা তুলে বলল, একটু চা করে দিই কাকাবাবু ?

মলিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলে নলিনী বললেন, না থাক্। বরঞ্চ রান্নাবান্না সেরে নাও। ছেলেপিলেদের খিদে পেয়েছে বোধহয়। রজনী আসুক, তখন দিও।

জবা রান্নাঘরে চলে যেতেই নলিনী আবার আনমনা হলেন। তখনো একই বর্ণের চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে চারধারে। গাছেরা ঘুমিয়ে পড়েছে কবে। পাখিরাও। রাত বাড়ছে একটু একটু। রজনীর ছেলেমেয়েদের কলকল স্তিমিত।

মনে মনে বুক উজাড় করে বললেন নলিনী, ওদের সুস্থ রেখো ঠাকুর। আর কিছুই চাই না। রান্নাঘর থেকে বাসন কোসনের মৃদু শব্দ আসছে। সময় গড়ায়। নলিনীর একেকটা পল যেন এক একটা বছরের মতো। কত উদ্বেগ, অগণন চিন্তা।

একা বসলে সব ভীড় করে, জাপটে ধরে। ঘরঘাট, রোগী, প্রিয় পরিজন, নিকট আত্মীয়ের ছদ্মবেশে হিংস্র কিছু লোক—এরা ঘিরে রাখে অবসরে বসলেই।

বরুণের ফিজিক্সের বই ঢাকা থেকে আনানো গেল না আজ। এখন তো আর কোনো কথা নেই। হারুর নিজস্ব সম্পদ ছেঁড়া-খোড়া বেশ কয়েকটা চামড়ার বল। দিনরাত একই স্বপ্ন—ফুটবল ফুটবল। ছোটবেলায় নিজেরা বাতাবি লেবু নিয়ে খেলতেন মনে আছে। চামড়ার যে বল হতে পারে সে সব শোনা কথা। চোখে দেখেছেন—যখন মিড্‌ফোর্ড মেডিকেলে পড়ছেন ঢাকায়। হারুর পড়াশোনায় পাহাড় প্রমাণ অনীহা। কী হবে ওর ?

সুরবালার ভীষণ পরিপাটি। একহাতে এতসব সামাল দিচ্ছেন। ধান জমিও তো কম নয়। সব বুঝে নিয়েছেন। পীতাম্বর, দশরথ আর কয়েক ঘর 'সিং' এরা সব সমঝে দেয় ওদের মা-ঠানকে। প্রচণ্ড বিষয়ী বাবার একটুও ভুল হয়নি নির্বাচনে। সবকিছু সমঝে দিয়ে বলেছিলেন, বউমা, খোকা (নলিনী) সব সামলাতে পারবে না। দেখেশুনে রাখলে কয়েক পুরুষ চলে যাবে। আরো একটা কথা বলে থেমেছিলেন বাবা।

সুরবালা বলছিলেন, —কী বাবা ?

পারুল তখন চার সাড়ে চার হবে। দাদুর হুঁকোর রবারের নল নিয়ে পালিয়ে গেছে কোথায়। এও এক মজা ওর।

বাবা বলছিলেন, ভিক্টোরিয়া গেল কোথায় ? তামাক এমনি পুড়ে যাচ্ছে। ওগো পারুদিদি। দে না রে ভাই।

দাদুর ভাই তখন কোথায়, কেউ জানে না। সুরবালা ছিলিম পাল্টে দিলেন অন্য হুঁকোয়। বললেন, দিন দিন ও কী হচ্ছে সবার আদরে, দেখছেন ?

পারুলের দাদুর গর্বিত জবাব, এমন হবেই তো। সিংহ রাশি দেবগণ। এ সিঁড়ির প্রথম মেয়ে। কেমন চেহারা দেখেছ আমার নাতনির ?

আবেগ ও অপত্য স্নেহে বৃদ্ধ বিস্মৃত হচ্ছেন যে—পারুলের গর্ভধারিনী সুরবালা পারুলকে চেনেন। সুরবালা হয়তো মনে মনে হাসছেন। বললেন, আরো কী কথা বাবা ?

এতক্ষণে যেন খেয়াল হয়। বললেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সদরের ভিটে পারুর জন্যে লিখে দিয়েছি। ওর বিয়ে অবধি কী বেঁচে থাকব ? আগে ভাগে দিয়ে রাখলাম। যৌতুক। কী বলো ?

পরে সুরবালার কাছে সব বৃত্তান্ত শুনেছিলেন নিজে নলিনী।

কথাগুলো মনে পড়তেই ভাবলেন—পারুর নামে সদরের বিরাট পাকা বাড়িটা আবার ফিরে গিয়ে রং করাতে হবে। ওখানে বরুণ থাকে এখন। দুজন কাজের লোক আছে। এ ছাড়া জ্ঞাতি গোষ্ঠী পরিচিত ছাত্ররাও বাড়িতে থেকে সদরের কলেজে পড়াশোনা করছে।

জবা চা দিয়ে গেল। রজনী এখনো ফেরেনি। চায়ে চুমুক দেন নলিনী।

উন্মনা অন্যমনস্ক নলিনীর সামনে যেন ঝিলিক দেয়—বড় বড় দুটো সুন্দর চোখ। চোখের তারায় যত রাজ্যের দুষ্টুমি। এমন এক জোড়া চোখ, যখন শরীর কাঁপিয়ে হাসে, তখন দুচোখে অপার মায়া। আবার যখন ঘুমোয়, বন্ধ চোখের পাতায় কোনো চপলতা থাকে না। দুটো হাঁটু মুড়ে ঘুমোয় বাবার বুকে মুখ গুঁজে। কে বলবে তখন—এ মেয়েটাই সতেরো আঠারো ঘন্টা দাপিয়ে বেড়ায়। শাণিত চাবুকের মতো শরীর, মুখে যা আসে অবিরাম বলতে থাকে। এখনো সময় হয়নি, তবু বরুণের কাছে অ্যালজেব্রা শিখে নিয়েছে। হারুকে মিড্‌ল্‌টার্ম ফ্যাক্টোরাইস্‌ বোঝায়। নলিনীর বুকে একদলা গর্ব আকার নেয় মাঝে মাঝে। রেডিওয় শুনে নেওয়া গান ভালো লাগলে কয়েকবার শুনেই প্রায় নির্ভুল গলায় তুলে নেয়।

অর্থ টর্থ না বুঝে গাইতে থাকে গুনগুনিয়ে। কখনো বেশ জোরে। ঐ তো কিছুদিন আগেও দাওয়ায় বসে কী এক হাবিজাবি করতে করতে একমনে গাইছিল—'শ্রাবণে রাতে যদি/স্মরণে

রাখো মোরে/বাহিরে ঝড় বহে/ নয়নে বারি ঝরে।'

তখন মা ছিলেন—নলিনীর মনে আছে। বরুণও ছিল বাড়িতে। কী বলতে যাচ্ছিল। মা তর্জনী নিজের ঠোঁটে চেপে নিঃশব্দে বলেছিলেন—চুপ।

নিজে বসেছিলেন উঠোনের ইজিচেয়ারে। সুরবালা বারান্দায় কুটনো কুটছিলেন। মাঠ থেকে ফিরে আসছে চরণ, পুতু আর সরমা।

আকাশে মেঘবৃষ্টি কিছু ছিল না। তবু গান গাইছিল পারুল। পুতুলের মুখে আঁক দিচ্ছিল কাঠকয়লা দিয়ে। পুতুলের চুল হয়তো...

একটা গানও পুরোপুরি গায় না পারুল কখনো। আগের গানটা শেষ হতেই হয়তো ধরল—'তোমারো অসীমে প্রাণ মন লয়ে.....' কিছুটা গেয়েই আবার চুপ। হয়তো গানের বাকি কথা জানা নেই। কিংবা আর গাইবে না, এমনি।

চোখের সামনে মেলে ধরে একবার দেখে নিল কাপড়ের পুতুলের কাঠকয়লায় অঙ্কিত চোখ, মুখ, নাক, চুল, ভুরু, ঠোঁট ঠিক হল কিনা। হয়েছে হয়তো। রেখে দিল পাশে। তারপর তাকাল গোয়ালের দিকে। এখান থেকেই দেখা যায়—বাছুরটা কোনো কারণে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। সরমা নির্বিকার জাবর কাটছে।

চরণ সম্পর্কে পারুলের নাতি। (সে সম্পর্কের এমন বাঁধন পারুলের প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং চরণের ঠাকুমার সুরেলা গলায় কর্কশ গর্জন, পুতুদা।

পুতুদার তখন হয়ে গেছে। চুপ্‌সে গেছে শঙ্কায়। বলল, কী, দিদি ? (পুতু পারুলের চেয়ে বয়সে বেশ বড়, তবু দিদি)

—চরণের মুখ শুকনো কেন রে ?

—কই ?

—তোর চোখ নেই। খাচ্ছে না কেন ?

—কী খাবে ?

—তোর মাথা খাবে। মেরেছিস ওকে ?

—না না। মারব কেন ? চরণ কত ভালো।

তবু বিশ্বাস হল না পারুলের। ওখান থেকেই জোরে জিজ্ঞেস করল, সরমা, চরণকে মেরেছে নাকি রে ?

সরমা চোখ তুলে বলল পারুলকে, না গো, মারেনি। বরঞ্চ কচি কচি দুব্বো ঘাস তুলে খাইয়েছে ওকে।

সরমার নিঃশব্দ কথা পারুল ছাড়া কেউ বুঝল না। বোঝার কথাও নয়। সরমা অন্যকে কিছু বলেও না তো, তেমন।

নিশ্চিন্ত হয়ে পারুল বলল, চরণ রে, খড়গুলো খা, এখন সন্ধের পর পেট ভরে খইল খাবি।

নিজের ঠাকুমার আশ্বাসে চরণ মুখ দিল কেটে রাখা কুচিকুচি খড়ে—যেগুলো দুপুরে অশ্বিনী কুচিয়ে রেখেছে।

কথাগুলো মনে পড়তেই কেন মুচড়ে ওঠে বুক—নলিনী ভেবে পান না। ও যেন ভালো থাকে ঠাকুর। খবর পেলেই ওরা রওনা দেবে। আর কয়দিন ? দেখা হবেই তাড়াতাড়ি। নলিনী ভাবছেন একমনে। মাথার চুল যতই আঁচড়ে দিক যামিনী—লাফালাফিতে অগোছালো সব। কখনো কপালে খেলছে, কখনো চোখ ঢেকে দিয়েছে কয়েক গাছি। মাথা দুদিকে দুলিয়ে নিজেই সরায় কখনো দুহাতে।

সুরবালা হয়তো বললেন, চুল বাঁধো দজ্জাল মেয়ে। শ্যাওড়া গাছের পেত্নী সেজেছে। যা, যামিনী চুল বেঁধে দেবে।

পারুলের স্পষ্ট জবাব, না। ওমনি থাক।

নলিনীর বুক ভার হয় অদ্ভুত মায়ায়। পারুল যখন জন্মাল, কী হুল্লোড় পড়ে গেল বাড়িতে। বাবা, জেঠা, জেঠিমা, বেঁচে ছিলেন তখন। দু-পুরুষে প্রথম মেয়ে। জেঠিমা হাতের সোনার বালা খুলে রেখে এলেন বারোয়ারি কালীবাড়ির প্রতিমার পায়ের তলায়।

ঢাকা থেকে রকমারি মিষ্টি আনালেন বাবা। গ্রামের প্রায় কেউই বাদ গেল না সেদিন। বাবার মুখে একই কথা, ওর বিয়ের তো অনেক দেরি। এতদিন কী বাঁচব ? কেউ যেন খালি মুখে না যায় রে খোকা।

আজ, এই প্রায় নির্জন উঠোনে বসে এসব কথা মনে পড়তেই বুকের ভিতর কনকন করে নলিনীর। কেমন আছে—কে জানে!

আবার মন প্রাণ ভরে কামনা করেন—সবাই সুস্থ সবল থাকে যেন। যাকে নিয়ে নলিনীর এত ভাবনা—সেই পারুল যে এখন অন্য আরেক নিরক্ষরেখার ওপারে—এত সব নলিনীর এখনো জানা নেই।

সাত

খুব লক্ষ করলে চেনা যায় এ বসুমতী। ধান মিলের লাগোয়া বুড়ো বটগাছের তলায় কখনো বসে থাকে আজকাল। কখনো শুয়ে থাকে কাত হয়ে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় দেহ রেখেছে। বাতাসে শন ওড়ে, আসলে বসুমতীর চুল। জলের স্পর্শ পড়েনি শরীরে কতদিন—নির্ণয় করা যায় না। ফর্সা মুখে শূন্যতা এত বেশি যে ফসলহীন ধূ-ধূ মাঠ মনে হয়।

বাঁ হাতে কেবল একটা শাঁখা। পলা নেই কোনো হাতে। সোনার চারগাছাচুড়ি ছিল দুহাতে। এখন নেই। হয়তো এই ডামাডোলে ফুসলিয়ে কিংবা জোর করে খুলে নিয়েছে। দুই কানেও কোনো আভূষণ নেই, গলা খালি। নাকে ছোট্ট নাকছাবি ছিল—এখন কেবল বিন্দুবৎ ছিদ্র আছে। ছিদ্রে প্রোথিত উল্লিখিত গয়না উধাও।

একদা লক্ষ্মীমন্ত দেহাবয়বে সেই মাধুর্য অবশিষ্ট নেই, সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে দেখলে যে কেউ আঁৎকে উঠবে। শরীরে পরিচর্যাহীনতার ছাপ। পায়ের পাতার পেছনদিক ফাটা, যেভাবে প্রচণ্ড খরায় জলের তৃষ্ণায় খেতিয়াল জমি ফাটা-ফাটা হয়। ঊর্ধ্বাঙ্গের আবরণী কবে ছিঁড়ে ফুঁড়ে গেছে। কাপড়ের আঁচলে আর কতটুকুই এক বিকল মস্তিষ্ক স্ত্রীলোক সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখতে

পারে।

সুতরাং নিদারুণভাবেই দৃশ্য হয় রাতুলের বরাদ্দের দুগ্ধ উৎস। কেবল দুটো চোখ যা বসুমতীর ঐশ্বর্য, আয়ত দুই চোখে অসীম বিষণ্ণতার ক্লান্তি আর ঘুম। কিংবা অন্য কিছু। অথচ নিঃসাড় পড়ে থাকলেও ঘুমোয় না। অনেকদিন থেকেই ঘুম নেই। ঘুমোয় হয়তো। তবে একে নিদ্রা বলা যায় না। সীমাহীন নিঃস্বতায়, ভোরে অচেতন হওয়া। আর এটাই ওর মনোবৈকল্য।

সেদিন বিকেলে সবাই প্রায় জোর করে নিয়ে এল—ফিরে আসার সময় বার বার পেছনে তাকাতে তাকাতে বলছিল, অনেক বেলা হয়ে গেল। রাতুলের মুখে কিছু পড়েনি এখনো। আমি যাব না গো। যাব না। ছাড়ো ছাড়ো আমায়।

যাবে কোথায় জানে না, কেন যাচ্ছে স্পষ্ট জানে না। জানার অবস্থায় ছিল না।

পেছনে পড়ে রইল সম্পূর্ণ দগ্ধ বসত গেরস্থালি, আরো কতকিছু। সব কিছুর অনুপুঙ্খ বর্ণনা হয় না। বাঁশ বন থেকে ওখানে নিজেই গিয়েছিল সেদিন বেলা বাড়ার পর। পুড়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া গ্রামের মাঝামাঝি।

নিজের বাড়ির সামনে যখন দাঁড়াল, কোনো কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তখনো ছাইয়ের তলায় আগুনের আঁচ। ধোঁয়া।

চার-চালা টিনের মূল ঘরটা পুরোপুরি ছারখার। দুমড়ানো টিন পড়ে আছে—যেন ফোসকা শুকিয়ে চামড়া উঠেছে ত্বকের। পাহাড় প্রমাণ ছাই ছাড়া কিচ্ছু নেই আর।

ও-ঘরেই তো রাতুল ঘুমিয়েছিল। একা। নিঃস্পন্দ প্রায় জনহীন গ্রামে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে বসুমতী। দ্বিজেনকে পায়নি কোথাও। রাতুলকেও না। ওর বাপ কোলে করে অন্য কোথাও পালাল কী ? বসুমতী স্পষ্ট বোঝে না।

কয়েকটা খন্ডিত লাশ পড়ে আছে ইতস্তত, কোনোটা পুড়েছে এমন—চেনা যায় না। একটা লাশের বাঁ পায়ের হাঁটুর তলায় পুরনো কাটা দাগ—এই চিহ্ন দেখে বুঝতে পেরেছিল বসুমতী—আধপোড়া, তলপেটে ধারালো অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন সহ ভোম্বল—ওর দেওর। দ্বিজেনের জেঠার মধ্যম ছেলে। অবনী জেঠাকেও চিনতে পেরেছিল। বুক ও পেট জুড়ে ফালা ফালা কাটা দাগ দা'র। জেঠার হাঁপানি ছিল। রাতের পর রাত ঘুমাত না। বুকের পাঁজর দেখা যেত। এ মানুষকে টুকরো করে কার কী লাভ হল—বসুমতী বুঝল না।

নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে আছে নাটমন্দিরের কিছুটা তফাতে। রক্ত শুকিয়ে কালচে। মানুষ পোড়ার গন্ধ এখনো বাতাসে।

মন্দিরের বিগ্রহ লন্ডভন্ড। ঝোলানো ঘন্টা শেকল সহ খুলে নিয়ে গেছে। পেতলের ঘন্টার ওজন প্রায় আড়াই সের। উঁচু করে তুলে ধরলে কচিহাতে রাতুলও বাজাত। ছোট গ্রাম, তাই ঘন্টার ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ত গোটা গ্রামে। তারপর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে, লীন হয়ে যেত হাওর ছাড়িয়ে ধানের ক্ষেতের ওপারে। যেমন হত সন্ধ্যায় শঙ্খের ধ্বনি।

একটা আধজ্বলা ঘরের সামনে উঠোনের কোণায়, লাউ মাচার পাশে, কোনো গৃহস্থ হয়তো কাপড় মেলে দিয়েছিল শুকোতে। আধপোড়া কয়েকটা কাপড় এখনো পড়ে আছে মাটিতে। শুধু

কোনো এক বালিকার সাদা ইজের তখনো হাওয়ায় দুলছে। ওটা অক্ষত আছে এখনো, কিন্তু বালিকার হদিশ নেই। সঙ্গে আরো কয়েকজন এসেছিল বাঁশবন থেকে। পুরুষ সবাই। স্ত্রী লোক বলতে বসুমতী একা। অন্য স্ত্রীলোকেরা ওদের ছেলেমেয়ে সহ তখনো বসে আছে বাঁশবনের আড়ালে। ওদের রাতুলেরা ওদেরই কোলে আছে।

যে যার কিছু না কিছু খুঁজছে। কারো কিছুই আর তুলে নেবার মতো নেই। সারা গ্রাম ঘুরে আবার ফিরে এসে দাঁড়াল বসুমতী নিজের ঘরের সামনে। সীমানার বেড়া জ্বলেনি, তবে দরজার (বাঁশে বাইন করা) গেটটা ভাঙা।

উঠোনে এল বসুমতী। ছাইয়ের তলায় তখনো আগুন আছে। গরম ভাপ লাগছে নাকে মুখে। চারধারে এতোসব মানুষ সহ বস্তুর দাহ হয়েছে—কোন্ দহনের কোন্ গন্ধ, তফাৎ করতে পারে না এখন। নিজের বসতের সামনে দাঁড়িয়ে রইল একমনে। মাটির বেদিতে তুলসীর গাছ তাপে কুঁকড়ে আছে। ছোট প্রদীপটা নেই। শুধু ছাইয়ের স্তূপ। ছোট্ট একটা সংসার পুড়ে এত ছাই ? অবশ্য চিন্তায়ও বসুমতীর অবাক লাগে। এ স্তূপের নিচেই কী ঘুমন্ত রাতুল ?

কথাটা মনে হতেই চিৎকার করে বসুমতী—না, না, না। এভাবে যায় না রে বাবা। রাতুল, কই তুই ?

দু তিনজন এগিয়ে যায় বসুমতীর কাছে। কপালে হাত দিয়ে বসুমতী উবু হয়ে বসে পড়েছে। কয়েকজন এগিয়ে এলেও বসুমতীকে কেউ কিচ্ছু বলল না। উঁকিঝুঁকি দিল জ্বলন্ত ছাইয়ের স্তূপে। একজন খোঁচা দিল যদি কিছু দেখা যায়। দেখা গেল না। ওরা ভেবেছে রাতুলের দগ্ধ লাশ বসুমতীর নজরে পড়েছে।

বসুমতী ভাবছে রাতুলের বাবা কোথায় ? ছেলেকে নিয়ে কী চলে গেল আরো নিরাপদ অন্য কোনোখানে। নিশ্চয় গেছে। না হলে বাপবেটা আর যাবে কোথায় ? নিজেকে অবিশ্বাস্য শক্তিতে আশ্বস্ত করে বসুমতী।

উঠোনের ঝাঁকড়া জবাগাছ, বেলী ফুলের গাছ। সব গাছের পাতা ঝলসে গেছে। ফুলে ফুলে ভরে যেত উঠোন। বেলীর সুঘ্রাণ উড়ত বাতাসে।

ধানের গোলাঘরে কিছুই নেই আর। এখানেও ভস্মের পাহাড়। উঠোনের উত্তর ভিটায় ঠাকুরঘর ছত্রভঙ্গ। কেবল আগুনের আঁচ অবশিষ্ট আছে। বাকি পুড়ে গেছে সব। একমনে, প্রায় স্থবির বসে রইল বসুমতী। কখন যেন পেছন থেকে পাড়ার সম্পর্কিত দেওর ভবেশ ডাকল—বউদি।

প্রথমে খেয়াল করেনি। জোরে দুবার ডাকতেই দৃষ্টি ফেরাল ওর দিকে। বলল, কী, ভব ?

—চলো ? আর কত সময় বসে থাকবে ?

—চলে যাব ? এখনি ?

—হ্যাঁ আমরা সবাই যাচ্ছি।

—কোথায় ?

ভব বলল, যেখানেই হোক। এখানে আর নয়। অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। এবার

হল তো সর্বনাশ!

ঘোরের মধ্যে বলল বসুমতী, ওদের যে এখনো পেলাম না রে ভব।

ভব কোনো কথা বলে না। একটু সময় চুপ থেকে বলল বেশ জোর দিয়ে, চলো, ওঠো। যেতে হবে এখন।

—কোথায় যাব আমরা ?

—নিরাপদ অন্য কোথাও পালাতে হবে।

—পালাব ?

—হ্যাঁ, আবার হামলা হতে পারে আজ রাতে।

বসুমতীর তীব্র আশা। বলল, ওরা যদি আমার খোঁজে এখানে এসে আমায় না পায় ?

—কারা ?

—তোমার দাদা আর রাতুল।

ভব থমকে যায়। কী বলবে ? গ্রামের দক্ষিণে, নিচু জলা জায়গায় হেলেঞ্চার ঝোপে, সে একটু আগে দেখে এসেছে অর্দ্ধদগ্ধ মৃত রাতুল সহ দ্বিজেনের লাশ। মাথা ফেটে চৌচির। কাউকে বলেনি। বলে কী লাভ ? সুতরাং বসুমতীকে বলল না বৃত্তান্ত।

আবার প্রায় জোর দিয়ে বলল, তুমি চলো। ওরা আসবে না এখানে।

—আরে না না। তা কী হয় ? আসতে পারে। আসতে পারে কী, আসবেই। আজ রাতটা বরঞ্চ থেকে যাই এখানে, কী বলো ভব ?

—কী বলছ বউদি!

—কেন ?

—এ ভূতুড়ে শ্মশানে কেউ থাকে ? দেখছ না, এধার ওধার কত লাশ ?

—থাকুক না। ওরা ঘুমিয়ে আছে। লাশেরা তো আর হামলা করে না।

ভব টের পায় বসুমতীর কিছু হচ্ছে। তবু বলল, তুমি চলো তো।

বসুমতীর একরোখা জবাব —না, যাব না। খুঁজতে খুঁজতে ওরা আমায় না পেয়ে যদি ফিরে যায় ? কোথায় পাবে আমাকে যদি চলে যাই ? আমায় না পেলে রাতুল ভীষণ চেঁচাবে। তোমার দাদা সামলাতে পারবে না তখন।

এবার নিষ্ঠুর নিয়তির মতো বলল ভব—তুমি বুঝছ না কেন ?

—কী বুঝব ভব ?

ভবেশ শীতল গলায় বলল, নেই সব শেষ হয়ে গেছে।

কথা শুনে স-ক্রন্দন চিৎকার করে বসুমতী, না ভব, না। ওকথা বলো না। ও কথা বলো না। এমন বলতে নেই। কী বাজে কথা বলছ তুমি ?

বসুমতী মাটিতে বসে পড়ে। একহাতে তখনো আঁকড়ে ধরা রাতুলের ভেজানো পাশ বালিশ। কান্না সহ প্রলাপ করে অবিরাম, ওরা আসবে। ওরা শেষ হয়ে যায়নি। আসবে। আমার খোঁজে আসবে। তোমরা যাও। আমি যাব না এখন।

কিন্তু বসুমতীকে সবার সাথে ফিরতে হয়েছিল সেদিন। ও জানলোই না দ্বিজেন আর রাতুল পড়ে আছে হেলেঞ্চা ঝোপের মাঝখানে, ওদের জন্মভূমিতে, নিষ্প্রাণ।

ভব কিছু বলেনি আর। কাকে বলবে। তারপর হাঁটাপায়ে অনেক দূর। দিনের আলোয় ঝোপঝাড় খুঁজে লুকিয়ে থাকা, আর রাতে পথ চলা। অন্ধকার বর্ষার রাতে নির্দিষ্ট কোনো পথ না পেয়ে বনবাদাড় হাতড়ে যারা প্রাণের ভয়ে ছুটে যায় নিরাপদ সীমান্তের দিকে, তাদের দুর্গতি কতটুকু, যারা এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি, তাদের কাছে অনুমিত হবে না কষ্টের ঘনত্ব।

প্রায় মনোবিকল বসুমতী অনুসরণ করে দলকে। ঠিক অনুসরণ নয়, জলের স্রোতের সাথে যেভাবে খড়কুটো ভেসে যায়, তেমনি এগিয়ে যায় ও। আর বার বার পেছন ফিরে তাকায়—রাতুল, রাতুলের বাবা যদি ফিরে আসে—এই আশায়।

ওদের নিশ্চিহ্ন গ্রাম তখন আর দেখা যায় না। কারণ সবাই এগিয়ে গেছে অনেক দূর। পেছনে পড়ে থাকা গ্রামের দূরত্ব প্রায় একদিনের। সীমান্ত আরো দূরে।

আর কিছুটা এগোলে রেলের ছোট্ট এক স্টেশন। ওখানে ট্রেন ধরা যাবে। কিন্তু রেলে যেতে কেউ ভরসা পায় না। মেঘনার উপর ভৈরব পোলের নারকীয়তা সবাই জেনেছে। এখন এ এলাকার কোথাও এক ইঞ্চি নিরাপদ ভূমি নেই—এই শঙ্কা সবার বুকে।

আট

নানা জায়গা ঘুরে বড় ছেলে বরুণের লেখা খাম রজনীর কাছে যে বার্তা এনে পৌঁছাল তা এরূপ—দিগরকোণা রেফ্যুজি ক্যাম্প থেকে লেখা।

তাং-৪.৪.৪৮ ইং

শ্রীচরণেষু বাবা,

প্রথমেই আপনি আমার ও অন্যান্যদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনি কোথায় আছেন অদ্যাবধি জানা যায় নাই। আপনি কোনো পত্র লিখিয়া থাকিলে উহা আমরা পাই নাই। এখনো স্পষ্ট জানা নাই—কোন ঠিকানায়, কোথায়ইবা আপনি আছেন বর্তমানে। তাই ক্যাম্প হইতে এই পত্রখানি লিখিতেছি অনুমানক্রমে প্রদ্যুম্ন মামার ঠিকানায়। ইহা যে কবে আপনার হস্তগত হইবে ঈশ্বরই জানেন। বাবা, কী লিখিব ? কলম সরিতেছে না। কিন্তু এই সম্বাদ আপনার সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন হইবে সম্বাদ না দুঃসম্বাদ বলিব জানি না। সংবাদ এই—আমাদের অশৌচ চলিতেছে। আজ তৃতীয় দিন। গত পরশুই লিখিতাম। খাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া দুইদিন বিলম্ব হইল লিখিতে।

তারপর লিখি—অশৌচের কারণ হইতেছে এই—আমাদের পারুলবালা গত পরশু রাত প্রায় শেষ প্রহরে ইহলক ত্যাগ করিয়াছে। ক্যাম্পের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সে ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়। তাহাকে বাঁচাইবার কোনোরূপ চেষ্টা করা সম্ভব হয় নাই। ঔষধ তো দূর, এক বিন্দু বিশুদ্ধ জলও দেওয়ার সংস্থান ছিল না। লোকে লোকারণ্য ক্যাম্প। কিছুই করার ছিল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে ক্যাম্প হইতে কিছুটা দূরে এক ছড়ার পাড়ে তাহাকে কাষ্ঠ করা হয়। মাত্র

কয়েকজন অপরিচিত শ্মশানবন্ধু ছিলেন। মা জোর করিয়া গিয়াছিলেন ঐখানে।

ওলাউঠায় মৃত্যু বলিয়া বেশি কেহ শ্মশানে আসিতে পারে নাই। কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না।

বাবা, আপনি শক্ত হউন। এই নিদারুণ সংবাদে আপনি ভাঙিয়া পড়িবেন জানি। কিন্তু কী করিব ? না জানাইয়া তো উপায় নাই। অশৌচ বলিয়া কথা। ইহা ছাড়া পারু সংক্রান্ত কোনো সংবাদ আপনার হইতে কী করিয়াই বা লুক্কায়িত রাখি।

মা কেমন যেন বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছেন। কোনো কথা না বলিয়া একমনে বসিয়া থাকেন। হারুটার অবস্থা আরো শোচনীয়। প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ওর স্বভাব তো আপনার জানা। পারু অন্ত প্রাণ। পারু যতই তিরস্কার তাচ্ছিল্য করুক, সে মন হইতে এইরূপ করিত না—ইহা হারু ভাল করিয়া জানিত। অতএব ওর অবস্থা সহজে অনুমেয়। মা এই আঘাত যে কীভাবে সহ্য করিতেছেন, ইহা তিনি ব্যতীত আর কেহ বুঝিবে না।

পারু যে এইভাবে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে ইহা ভাবিতে পারি নাই। তাহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেই বা কী উপায় হইবে বুঝিতেছি না।

আবার লিখি—আপনি ধৈর্য হারাইবেন না। কী অদৃষ্ট আমাদের—এই শোকের সময়ও আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিলাম।

আবার কবে সবাই একত্রিত হইব, কবেই বা পুনরায় দেখা হইবে জানা নাই। দেখা হইলেও পারুকে তো আর পাইব না আমরা।

বাবা, ওকে আমি কোনোমতে ভুলিতে পারিতেছি না। বুকের পাঁজর ভাঙিয়া যায় ওর কথা ভাবিলে। কেন এমন হইল। ও আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা। তবু সে সর্বাগ্রে চলিয়া গেল কেন ? ওর পরিবর্তে ভগবান আমাকে লইয়া গেলেন না কেন ?

হারু কোনো কথা বলে না বাবা। কেবল চোখের জল ঝরায়। বা কখনো থম ধরিয়া বসিয়া থাকে। ক্যাম্পের অদূরে।

সেই দিন শ্মশান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যে চলিয়া গিয়াছিল জানি না। ফিরিল অনেক বিলম্বে। জিজ্ঞাসা করিতে বলিল পারুর জন্য কাঁচের চুড়ি খুঁজিতে গিয়াছিল। কবে কোনো একদিন নাকি পারু রঙিন কাঁচের চুড়ি চাহিয়াছিল তাহার কাছে। সেইদিন দিতে পারে নাই, তাই আজ বাহির হইল।

গতকাল দুপুরেও ছুটিয়া গিয়াছিল ছড়ার দিকে—যেখানে পারুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছে। মা, আমি আর যামিনী বহুকষ্টে ধরিয়া আনিয়াছি। তারপর মা ও যামিনীর বুক ফাটা কান্না।

এমতাবস্থায় আমি কী করিব ? কাহাকে সামলাইব ? হারুর জন্য দুশ্চিন্তা হয়। শোক সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। মাঝে মাঝে হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে আর বুক চাপড়ায়, তখন আমরা অসহায়ের মতো ওর কান্না দেখি আর নিজেরাও কাঁদি।

বাবা, আমাদের কী হইবে ? ঘর নাই, ভিটা নাই, কিচ্ছু নাই। তবু কোনো দুঃখ নাই। কিন্তু পারু যে নাই—এই কষ্ট সহ্যের অতীত হইয়াছে।

সব কথা গুছাইয়া লিখিতে পারিলাম না। অনেক অদরকারি কথাও হয়তো লেখা হইয়া গেল। মন হাল্কা করিবার জন্য কত কথা লিখিলাম। কিন্তু হয় নাই। বরঞ্চ আরো ভার হইল। আর কী লিখিব, খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা বর্তমানে তিনজন একত্রে আছি। আপনি ওখানে একা। এ সংবাদ যে আপনাকে কী করিবে অনুমান করিয়া শিহরিত হই। কারণ, পারু যে আপনার কাছে কী ইহা তো আমরা জানি। বাবা, আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়া দূর, উপরন্তু আপনার মন আরো ভারাক্রান্ত করিয়া দিলাম নিষ্ঠুরের মতো। কী করিব ? আমার সব কিছু খাক হইয়া যাইতেছে।

বাবা, ধৈর্য ধরিবেন। জন্ম-মৃত্যুতে কাহারো হাত নাই। এই কথাগুলিই ঠাকুরমার দেহত্যাগের পর বলিয়া আমাদের বুঝাইতেন—আমার স্মরণে আছে।

পারু চলিয়া গেল—ইহাই একমাত্র সত্য আমাদের কাছে। তাহার আত্মার শান্তি কামনা করা ব্যতীত আমরা আর কীই-বা করিতে পারি ?

আপনার জন্য ভীষণ ভাবনা হইতেছে। কবে কোথায় দেখা হইবে—জানা নাই।

আমরা কী রকম আছি—এই বিষয়ে আর কী লিখিব ? কিছুই লিখিতে মন চাহে না। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইবেন।

ইতি, প্রণত বরুণ।

দীর্ঘ চিঠিখানা একবার পড়ে কিছুই মাথায় ঢুকল না নলিনীর। বিকেলে বাড়ি ফেরার পর রজনী চিঠিটা দিয়েছে। ঠিকানা লেখা খামে অক্ষর দেখে চিনতে পেরেছিলেন। বরুণের চিঠি। এই ছেলে খুব ধীমান। স্থির। সদরের কলেজে পড়ে। লেখাপড়ায় খুব ভালো। নলিনী উৎফুল্ল হয়েছিলেন চিঠিটা হাতে পেয়ে। যাক্ ওদের খবর এল।

ত্বরিতে চিঠি খুলে পড়তে শুরু করেছিলেন। যতই পড়েন কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় না। দুই চোখে আঁধার নামে। টলতে টলতে কোনোমতে দাওয়ায় বসে পড়েন।

জবা লক্ষ করে ছুটে এল পাশে। জোরে ডাকে, কাকাবাবু কী হয়েছে ? ও কাকাবাবু ? শরীর খারাপ লাগছে ? তারপর আরো জোরে ডাকে, শুনে যাও। দেখো না, কাকাবাবু কী করছেন।

ভেতরে গিয়েছিল রজনী কাপড় ছাড়তে। ডাক শুনে দৌড়ে বেরোয়। ছেলেপিলেরাও। বাইরে এসে রজনী বলল, কী হয়েছে ?

জবা উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, দেখো না, কাকাবাবু কথা বলছে না।

রজনী নামল উঠোনে। দাওয়ায় ঝুঁকে বসে পড়া নলিনীর সামনে দাঁড়াল।

নলিনীর শিথিল শরীরে কোনো চেতনা নেই যেন। দৃষ্টি ফাঁকা। চোখ শুকনো। চোয়াল ও ঠোঁট ঝুলে পড়েছে।

রজনী আবার ডাকল, কাকাবাবু, কী হয়েছে ? ও কাকাবাবু।

খুবই ধীরে মুখ তুলে একবার তাকালেন নলিনী। বাঁ-হাতে ধরে রাখা খোলা চিঠিটা একটু তুলে বললেন, চিঠি।

—কার চিঠি ? কী লিখেছে ? কোনো খবর কি ?

একটু থমকে ঢোক গিললেন নলিনী। ডান হাতে বুকে চাপ দিলেন। বুকের সব বাতাস গেল কোথায় ? গলার স্পষ্ট কোনো স্বর ফোটে না কেন ? আবার তাকালেন ওপরে, সামনে ঝুঁকে থাকা রজনীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে।

রজনী বলল, কী হয়েছে কাকাবাবু ? চিঠিতে কী আছে ? খরে খরে, প্রায় ডুবে যাওয়া গলায় কোনোমতে বললেন নলিনী, সর্বনাশ!

—কী হয়েছে ? কী সর্বনাশ!

—নেই!

—কী নেই ?

চিঠিটা কখন হাত থেকে পড়ে গেছে। ঐ হাতেই কোনোমতে কিছুটা তুললেন। যে নেই, তার দৈহিক উচ্চতা দেখালেন হয়তো। তারপর ডাকলেন ক্ষীণস্বরে, রজনী।

—কী কাকাবাবু ?

—নেই!

রজনী হাত রাখল নলিনীর হাঁটুতে। বলল—কী নেই কাকাবাবু ?

নলিনী যেন বহু দূরে, ঘড় ঘড় কফ যেন গলায়, তেমনি প্রায় মিইয়ে যাওয়া স্বরে বললেন, ও।

—কে ?

—ও নেই!

—কেন নেই ? কার কথা বলছেন ?

নলিনী আবার বললেন না বলার মতো, রজনী, ও !

আর কিছুই বলতে পারলেন না নলিনী।

ঢলে পড়লেন দাওয়া থেকে উঠোনে। রজনী ও জবা জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, কাকাবাবু, কাকাবাবু।

রজনীর ছেলেপিলেরা ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে। জবা প্রায় কেঁদে ফেলল, কাউকে ডেকে আনো না। কাকাবাবুর কী হল ?

রজনী কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। তবু বলল, তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসো। জলের ছিটে দাও। গরম দুধ আনো তো এক গ্লাস। আর কথা অসম্পূর্ণ রেখে রজনী ছুটল অন্ধকারে, হয়তো কোনো ডাক্তার বা অন্য সাহায্যকারীর খোঁজে।

নলিনীর তখন কোনো সংজ্ঞা নেই। বুক ওঠানামা করছে। অবসন্ন শরীরের ক্লান্ত বাঁ হাত মুচড়ে পড়ে আছে বুকের তলায়। জবা সরাবার চেষ্টা করছে সন্তর্পণে।

রজনীর শব্দহীন বসতবাড়ির চারধারে সন্ধ্যা নিঃশেষ হয়ে একটু একটু রাত হচ্ছে। জারুল গাছের কোনো গোপন অন্ধকার ডালে, সেই পাখির বিদীর্ণ ডাক—নিম্ নিম্ নিম্ নিম্। অন্য পাখিরা যে যার ফিরে গেছে ঘরে অনেক আগে।

খবরটা আজ এল। অথচ ঘটনার মাসখানেক পেরিয়ে গেছে এতদিনে। বরুণের চিঠিটা

পড়ে রইল অন্ধকার উঠোনে। কেউ তুলল না।

নয়

প্রথম দিনে ক্যাম্পে জিজ্ঞেস করেছিল রিলিফের বাবুরা, তোমরা কয়জন ?

বসুমতী বলল, আমরা তিন জন। আমি, রাতুল। আমার ছেলে আর কি। আর, রাখো বলছি, একটু চিন্তা করে বলল, ওর বাবা। কী যেন নামটা। একটা নাম তো ছিল। মনে নেই। মনে নেই। রাখো রাখো। আরো আছে—ঐ যে মুরলী। মুরলীর ছেলে। কী ডাগর।

একজন বাবু বলল, বাকিরা কই ?

বসুমতী ডানহাতের তর্জনী দিয়ে পেছন দিকে দিক নির্দেশ করে বলল, আসছে। পেছনে আসছে। হাওয়রের পারে জালটা শুকোতে দিয়েছিল। গাব গাছ চেনো ? গাব গাছের কষ লাগিয়েছে তো। জালটা তুলে আনতে গেছে। ওগো, রাতুলকেও তো তুলে আনবে। ঘুমিয়েছিল। কত কিছু আনতে আনতে পেছনে রয়ে গেছে।

—তুমি এখন একা ?

বসুমতীর ম্রিয়মান প্রতিবাদ। বলল, একা কেন ? ওরা আছে তো। আসছে। রাতুলকে ঘুম থেকে তুলে আনতে দেরি হয়ে গেল বোধহয়। ওর বাবা গেছে। ঘুমিয়ে ছিল তো। এসে পড়ল বলে। আমাদের ছেলে রাতুল। এখনো বছর পুরোয়নি ওর। আশ্বিন কবে ? খুব ছটফটে, হাসে।

বাবু উত্যক্ত, তবু বলে যায় বসুমতী—মুখে কথা ফুটেছে। স্মা-স্মা ডাকতে পারে। বাবা বলতে পারে না এখনো। ও আসবে। আমরা তিনজন। না না বাবু, পাঁচজন, বললাম তো। লিখে রাখো না।

ক্যাম্পের বাবুরা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়াচায়ি করে।

চলে আসার তৃতীয় দিন দুপুরের পর বসুমতী দল ছুট হয়ে যায়। গাছের ছায়ায় সবাই যখন বিশ্রাম করছিল, সে সরে যায় উল্টোপথে। মাথায় এক দিশা ফিরে যাবে আবার গ্রামে। ওরা যদি ওকে না পেয়ে আবার ফিরে যায়! দিকচিহ্ন হারিয়ে যাওয়ায় দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে যায় বসুমতী। প্রায় একদিন একা একা, খোলা প্রান্তর তারায় তারায় পরিপূর্ণ আকাশের তলায় রাতেও বনবাদাড়ে হাঁটে ক্লান্তিহীন। লক্ষ্য,—দ্বিজেন, রাতুল বাস্তুভিটে। তারপর একসময়, মাছের এক ভেড়ির বাঁধের পাশে শুয়ে পড়ে শ্রান্তিতে।

ঐ পথে পালিয়ে আসা একদল উৎখাত লোকজন মায়াপরবশ হয়ে ওকে নিয়ে চলে ওদের সাথে, শেষ পরিচিতরাও কোথায় হারিয়ে যায়, কিংবা বসুমতী মিশে যায় ভিটেমাটিহীন এক বিশাল জনগোষ্ঠীর ভিড়ে।

পাশে বসা অন্য বাবু তাড়া দিল, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তোমার নামটা শুধু বলো।

—আমার নাম ?

—হ্যাঁ, তোমার নাম।

—ওদের নাম লিখবে না ? রাতুল, ওর বাবা, মুরলী, মুরলীর বাছুর ?

আবার চাওয়াচায়ি করল বাবুরা। অন্যজন বলল, ঠিক আছে। ওরা এলে ওদের নামও লেখা হবে। এখন তোমার নামটা বলো তো তাড়াতাড়ি। দেখছ না, কত লোক ? কত নাম লিখতে হবে। বলো, নামটা বলো আগে।

—কার নাম ?

—আবার বলে কার নাম ? তোমার নাম।

—আমার নাম। আমার নামটা যেন কী ? রাতুল তো ডাকত আধো আধো স্মা-স্মা। ভব ডাকে বৌদি। রাতুলের বাবা বলে ওগো শুনছ। কিন্তু আমার নাম....'

কথা বলতে বলতে বসুমতী শুকনো চুলে হাত বোলায়। পেছনের ঠেলা ধাক্কায় তখন লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে একপাশে। আরো ঠেলাঠেলিতে রিলিফ বাবুদের টেবিল থেকে অনেক দূরে সরে গেছে—ত্রিপলের একচালা শেডের বাইরে।

তখনো মনে করার চেষ্টা করে একমনে, ছেলের নাম বোধহয় রাতুল, দ্বিজেন কার নাম ? গোরুটার নাম মুরলী, বাছুরের নাম এখনো রাখা হয়নি। আর আমার নাম। আমার নাম....

দুদিকে মাথা দোলায় বসুমতী। কিল মারে মাথায়। তারপর জোরে জোরে হেসে নেয় কিছুটা। আপন খেয়ালে বলে যায়। —মনে পড়ে না কেন ? নামটা কোথায় গেল রে! ওটাও কি ভিটের সাথে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। না, চলে গেল অন্য কোথাও ওদের খোঁজে। ও রাতুল আমার নামটার কী হল রে বাবা!

মাথায় চুল টানাটানি করে এবার। হাসে। অনবরত বক বক করে, হায় রাধে! ওর দুধ খাওয়ার সময় কখন পেরিয়ে গেছে। বাপের আক্কেল দেখো। অভুক্ত ছাওয়ালটাকে নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনো। কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই!

বসুমতীর বাঁ হাতের বগলে আঁকড়ে ধরা পাশবালিশ তখনো আছে। বালিশটা এবার বুকে চেপে ধরল যত জোরে পারে। রাতুলের ব্যবহৃত ভান্ডার থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোয় অমূল্য মাতৃদুগ্ধ। রাতুলের ভেজানো বালিশ আবার ভিজে গেল মানবিক অথচ হাহাকারময় শুভ্র নির্যাসে।

বসুমতী কঁকিয়ে উঠল। বাবা, কই তুই ?

বসুমতী বালিশের গন্ধ নেয়। ওখানে রাতুলের পুঞ্জিভূত ঘ্রাণ। ওকে আরো বেশি বিঘ্নিত বিপন্ন করে। তাই বুক চাপড়ে জোরে জোরে কাঁদে। আকাশের পাখিরা দূরে সরে যায়। এমন হাহাকার ওদের ক্ষুদ্র বুক বিদীর্ণ করে দেয়। আর, একটু দূরে জটলা করা অগুন্তি মানুষ তেমন গুরুত্ব দেয় না বসুমতীর বিলাপের।

তখন ওরা ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত—নতুন মাটি, নতুন জল, নতুন আকাশ, আরো এক নতুন অপরিচিত ভূগোলের সন্ধানে।

তারপর কখনো ক্যাম্পের কোনো এক কোণায়, কখনো বাইরে—সরকারি খাতায় নামহীন এক বাস্তুহারা স্ত্রীলোক এদিক ওদিক পড়ে থাকে।

কোনদিন খাওয়া মেলে, কোনদিন মেলে না। খাওয়ার স্পৃহা নেই। পেলে কিছুটা খায়। দু-এক গ্রাস মুখে নিয়ে চোখ কুঁচকে তাকায় দূরে। কিছু খোঁজে। বুক হু হু করে হয়তো—রাতুলটার

এখনো কিছুই খাওয়া হল না। তখন অর্ধভুক্ত খাবার ফেলে উঠে যায় অন্য কোনোখানে। বাকি খাবার কাক, কুকুর ও মানুষ হানাহানি করে খেয়ে নেয়। মানুষ বেশি অংশ খায়, কুকুর কিছু কম, কাক মাত্র কয়েক দানা।

চারিদিকে খাদ্যের অভাব, খাদকের অভাব তো নেই।

এবার আশ্রয় নিল ধানমিলের সামনে বটতলায়। বিষয় সম্পদ বলতে ঐ বালিশ। গত পরশু, একটু রাত বাড়তেই অন্তত পাঁচজন মিলে ওর দুর্বল নিরন্ন শরীর দলামচা করল অনেকক্ষণ, ক্ষেপে ক্ষেপে।

বসুমতী কোনো শব্দ করতে পারেনি। ক্ষুধার্ত দ্বিপদ হায়নারা ওকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল এক সময়।

উদোম শরীরে বসুমতী পড়ে রইল রাতভর গাছের তলায় একা।

ভোর ভোর সময়ে পাখিরা জাগতেই কলরব শুরু হয়ে গেল। এমন নির্মম দৃশ্যে ওদেরও বুঝি কষ্ট হয় ভীষণ। কিন্তু কী করবে ? ওদের তো আর হাত নেই যে—এক নিঃস্ব নারীর আব্রু ঢেকে দেয় সযত্নে। পাখিরা কেবল বসুমতীর নিশ্চল শরীর ঘিরে ওড়াউড়ি করে অনবরত, যাতে প্রায় উন্মাদ এক স্ত্রী লোকের সম্ভ্রম কিছুটা বাঁচিয়ে রাখা যায় অন্তত।

দশ

নিথর দুপুরে শান্ত গলির পথে ঠিক এমন সময় প্রায়ই শোনা যেত ফেরিওয়ালার হাঁক—'লগে, রঙিন চুড়ি, চুলের ফিতা, নখ পা-লি-শ....।'

আজ, এখনো শোনা যায়। বাসার সামনে পাঁচ ফুট বাই আট ফুট একফালি ঘরে নলিনীর ডাক্তারখানা। দেওয়াল ঘেঁষে হাতল ও হেলান দেওয়া লম্বা একটা বেঞ্চ। এখানে রোগী এলে বসে। ডানদিকে নলিনীর ছোট্ট টেবিল ও চেয়ার। পেছনে পর্দায় ঘেরা উঁচু একটা বেড্ রোগীকে শুইয়ে পরীক্ষা করার। দেওয়ালে কয়েকটা ঝুলন্ত ছবি—মানবদেহ, মস্তিষ্ক, হৃদপিন্ড, হাড়গোড়। বাঁদিকে ঝোলানো হাস্যময়ী মহিলার ছবি—ইন্দিরাগান্ধী। কপালের উপর কয়েক গাছি চুলে পাক্ ধরা। এত সুন্দর মহিলা পুরুষের মতো চুল কাটেন কেন—নলিনী মাঝে মাঝে এমনি ভাবেন।

একদিন সুরবালাকে বললেন—চুল কাটবে ?

কাঠের গোলাকার ফ্রেমে কাপড় আটকে রেশমের সুতোয় খুব মিহিন নক্সা তুলছিলেন সুরবালা। নলিনীর কথা শুনে একটু অবাক হয়ে বললেন—কী!

—চুল কাটবে ? এই এতটা।

সুরবালার কাঁধ অবধি দেখিয়ে তাকিয়ে রইলেন। সুরবালাও তাকালেন নলিনীর দিকে। বললেন, চুল কাটব কেন ?

—ঐ মহিলার মতো দেখাবে ?

—কোন মহিলা ?

—ঐ যে, ডাক্তারখানায় ক্যালেন্ডারে আছে।

—কার ছবি ?

—ইন্দিরা গান্ধি।

—ইন্দিরা গান্ধি!

—হ্যাঁ গো চেহারাটা প্রায় একরকম। কেটে ফেলো না। খুব মানাবে।

সূচিকর্ম বন্ধ করে সুরবালা আবার তাকালেন নলিনীর দিকে। নলিনী হাসছেন। সুরবালাও স্মিত হাসলেন। বললেন, সেই কখন মাত্র দুজন এসেছে। একজন কিছু দেয়নি। বলেছে বিকেলে দিয়ে যাবে। একজন যা দিয়েছে ড্রয়ারে পড়ে আছে। নিয়ে নিতে পারো। সুরবালা হেসে বললেন, তাই আমার চুল নিয়ে পড়েছ ?

—তা নয়। ছবিটা দেখে মনে হল।

—কী মনে হল ?

—তোমাকে যদি ঐ মহিলার মতো সাজানো যেত।

—তুমি দিন-দিন বাচ্চা হয়ে যাচ্ছ।

—ভালোই তো। তোমার আঙুল ধরে গুটি গুটি হাঁটব।

—আর আমি যখন থাকব না, তখন ?

নলিনী বসলেন সুরবালার তক্তাপোষে।

ডানহাত ওর কাঁধে রেখে বললেন গম্ভীরস্বরে, কে কখন চলে যাবে কেউ বলতে পারে ? আমি যখন থাকব না। খুব গুমোর তোমার না ? তুমি থাকবে না কেন ?

—না গো, গুমোর কেন ? এমন তো হতে পারে।

নলিনী উঠে পড়লেন বিরক্ত হয়ে। বললেন, ধুত্তোরি। একটু মজা করতে চাইলাম। এই ভদ্রমহিলা কী বলছে দেখো।

সুরবালাও উঠলেন। বললেন নরম স্বরে যতটা পারা যায় গলা নামিয়ে, একটু চা করি দিই, খাবে ? চানের তো দেরি আছে। গরম জল বসাইনি এখনো।

অভিমান বা অন্য কোনো মানবিক আবেগে মাথা নাড়লেন নলিনী, না, খাব না, লাগবে না।

সুরবালা বুঝলেন, কোথায় কী হচ্ছে। বললেন, ক্ষমা করে দাও লক্ষ্মীটি। আমিও তো মজা করেছি। এই বালককে একা ফেলে কোথাও যেতে পারি কি আমি ? পারি না গো! ঠিক তখনই, সদর রাস্তা থেকে ডাক এল—'লা-গে, চুলের ফিতে, গোলাপি সাবান, তুহিন স্নো, রঙিন চুড়ি, রেশমি ফিতে...।'

এখন আর কেউ বায়না ধরে না, কিনে দাও না বাবা, ও বাবা।

কতদিন হয়ে গেল, এমন বায়না নেই। নলিনীর মনে হয়। এই তো সেদিনের কথা। একনাগাড়ে আব্দার—বাবা গো, ও বাবা।

—কী ?

—আবার কবে যাবে ?

—কোথায় ?

—সদরে।

—যাব যে কোনো একদিন। কেন ?

—কয়েকটা জিনিস এনে দেবে। খুব দরকারি কিন্তু।

—কী এমন জিনিস রে ?

—আছে। যখন যাবে কাগজে লিখে দেব। এখন বললে সব ভুলে যাবে।

—আচ্ছা দিস।

আজকাল কেউ বায়না ধরে না, যা কেনার সুন্দর সুন্দর দোকানে গিয়ে কিনে আনে সবাই। তেমন ফেরিওয়ালা তো দেখা যায় না আর।

কেবল একজনই আসে মাঝে মাঝে। সে তো একা আসে না। পেছনে ফেলে আসা সেই দিনগুলিও ফুলটুসিকে (পারুল) হাত ধরে নিয়ে আসে এই গলির পথে, ভরদুপুরে। কোনোদিন শেষ বিকেলে।

নলিনী জানতেন পারুলের কী কী দরকারি জিনিস। আলতা, পায়ের নূপুর, কাঁচের চুড়ি, চুলের ফিতে, কাঠি লজেন্স, তাল মিছরি, পুতুলের শাড়ির কাপড়, নখের পালিশ, ক্ষুদে দূরবীণ, আরো কত ?

নলিনী আবার বসে পড়েছেন সুরবালার বিছানায়। সুরবালা গেছেন রান্নাঘরে চা-র জল বসাতে। ফিরে এসে বললেন, চা খেয়ে চানটা সেরে নাও। লক্ষণকে বলেছি ডাক্তারখানার সামনের দরজা ভেজিয়ে দিতে। আর খুলে রেখে কাজ নেই। এতক্ষণ খেয়াল করেননি নলিনীকে। সেলাই-র সামগ্রী তুলে রাখছিলেন। চশমাটা সারালেন। আর একটু হলেই নলিনী বসে পড়েছিলেন চশমার উপর।

আনমনা নলিনীকে বললেন, কী হল তোমার ? কী ভাবছ ?

নলিনী তাকালেন সুরবালার দিকে। বললেন, ওই ফেরিওয়ালা!

সুরবালা বোঝেন নলিনীর ফেরিওয়ালা মানে কী ? তাড়া দিলেন, চা নিয়ে আসছি। তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে বাথরুমে যাও। গরমজল হয়ে গেল প্রায়।

মাথায় আমার তেলটা দাও না কেন ? আমি দিয়ে দেব, দেখবে মাথা ঠান্ডা থাকবে। ঘুম হবে রাতে।

এবার অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করলেন নলিনী, রোজ রাতে তোমার ঘুম হয় ? আমার হয় না গো।

—জানি।

—কী করে জানলে তুমি ?

চুপ হয়ে গেলেন সুরবালা। নলিনী বললেন, তুমি যা ঘুমোও, তাকে ঘুম বলা যায় না। অন্তত আট ঘন্টা ঘুমোনো উচিত তোমার। ডাইজিপামের ডোজ বাড়িয়ে দেব।

সুরবালা বললেন, একটু তফাতে অন্য বিছানায় একটা লোক প্রায় জেগেই থাকে সারারাত। কীভাবে আমি ঘুমাই বলো তো ?

নলিনী জানেন, এ কোনো প্রশ্ন নয় সুরবালার। বরঞ্চ আন্তরিক দুশ্চিন্তা ও আবেদন—তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো। মাথা ঠান্ডা হলেই ঠিক ঘুম আসবে। দুজন নিকটতম সঙ্গী একজন ঘুমিয়ে, আর অন্যজন একা একা জেগে থাকে—এ হয় না। বোঝো না ?

সুরবালার প্রতিটি কথার, শব্দের মর্মার্থ নলিনী ধরতে পারেন। সুরবালাও নলিনীর।

নলিনী বললেন, আচ্ছা দাও। তুমিও খাবে একটু।

—না।

—খাই না একসাথে।

—এক কাপ জল দিয়েছি। আবার কে করবে ? বিরাট এক সমস্যা যেন, নলিনী অতি সহজে সমাধান করে দেন।

—ভাগাভাগি করে খাব। আমি পিরিচে, তুমি পেয়ালায়। হল তো ?

স্মিত হেসে সুরবালা বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, দিন দিন ছোট হচ্ছ তুমি।

চা আনলেন সুরবালা। বড় গ্লাসে চা এনেছেন। সঙ্গে দুটো কাপ, একটা পিরিচ। কাপে চা ঢেলে পিরিচ সহ এগিয়ে দিলেন। মেডিকেল জার্নালের পাতা উল্টাচ্ছিলেন নলিনী। ছোট্ট একটা খবর আবার পড়লেন—সাউথ আফ্রিকার কেপটাউন হাসপাতালে মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক রোগীর হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছেন ড. বার্নাড নামে একজন কার্ডিও সার্জেন। রোগী এখনো বেঁচে আছে। এটাই পৃথিবীর সর্ব প্রথম হৃদ্‌পিন্ড সংস্থাপন। সার্জারি অনেক এগিয়ে গেল। সেই মিডফোর্ডের ক্লাশে শুনেছিলেন, অনেক কিছু ভবিষ্যতে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব হবে। পশুর হৃদপিণ্ডের ভাল্ব মানুষের হৃদপিন্ডে সংস্থাপিত হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে।

সুরবালা বললেন, জুড়িয়ে যাবে। চা-টা খেয়ে চানে যাও তো। তোমার পাল্লায় পড়ে এই অসময়ে চা।

—একটু খেলে কিচ্ছু হয় না।

—দুপুরের খাওয়া কখন খাবে ? কটা বাজে দেখেছ।

—বাজুক। শোনো, চা খেয়ে শুয়ে পড়ো। প্রেসারটা চেক করব।

—কাউকে পেলে না আজ, আমাকে নিয়ে তোমার যত ডাক্তারি।

এবার কৌতুকসহ গম্ভীর স্বরে অন্য কথা বললেন নলিনী, তুমি কী শুধু আমার রোগী ?

—আর কী ?

—অনেক কিছু।

—আমি অনেক কিছু। তারপর ?

—একটা পরিবারে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কী জিনিসের জানো ?

মাত্র কয়েক চুমুক চা নিয়েছিলেন সুরবালা নলিনীর মন রাখতে। সেটুকু শেষ করে বললেন, কী জিনিস ?

—সংহতির সুতো।

—কী জানি বাবা।

—হ্যাঁ গো, এই সুরবালা দেবীই পরিবারের সংহতির সুতো।

সুরবালা একটু হাসলেন। বললেন, সারারাত না ঘুমিয়ে এসবই ভাবো ?

—শুধু কী তাই ? আরো কত কথা ? আমার কথা, তোমার কথা, পারুলের কথা, সবার কথা, সমাজের কথা, দেশকাল কিচ্ছু বাদ দিই না। তোমাকে বলেছি কতবার।

—কী বলেছ ?

—কলেজে পড়ার সময় একটা রাজনৈতিক মতবাদে তীব্র বিশ্বাস ছিল।

—কী ?

—মার্কস্‌বাদ।

—সে তো জানি। খালি স্বপ্ন, খালি স্বপ্ন তোমাদের।

—ঠিকই তো। স্বপ্ন ছাড়া কী আছে জীবনে ?

ইদানীং মার্কসবাদকে আমার কী মনে হয় জানো ?

—কী মনে হয় ?

—হিউম্যানিস্টিক রোমান্টিসিজম।

সুরবালা দ্বিধাহীন বললেন, কী বলছ, বুঝিয়ে বলো। আমার দৌড় তো জানো।

সুরবালার কথা গ্রাহ্য না করে নলিনী বললেন, একটা লোক সারাজীবন মানুষের কল্যাণের কথা বলে গেল অথচ কেউ তেমন গুরুত্ব দিল না।

সুরবালা কপট অভিজ্ঞতায় বললেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ালে এমনি হয়। দয়া করে আপনি চলে যান ডাক্তারবাবু। জল গরম হয়ে গেছে। মানুষ মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি করে। তোমার ঐ সাহেবের কথা কেউ কোনোদিন শুনবেই না দেখে নিও। যখন কেউ কারো কথা শুনতে চায়, বুঝবে, ওর কোনো স্বার্থ আছে।

—তুমি সবকিছু নাকচ করে দাও কেন বলো তো ? তোমার সাথে কথা বলাই মুশকীল।

—চান সেরে, খাওয়া দাওয়া করে, একটু ঘুমিয়ে সন্ধ্যার পর যদি কোনো রোগী টোগি না পাও, যত পারো কথা বলো, আমি শুনব।

—এক বালককে বক বক করাবে ?

সুরবালা হেসে বললেন, না রে বাবা, বালক কেন ? চুলে পাক ধরেছে, নাতি নাতনী ঘর ভরিয়েছে, নিজের বাঁদি বুড়ি হয়েছে।

নলিনী বোঝেন সুরবালা কোন মেজাজে আছেন। জার্নালটা টেবিলে রেখে শার্ট খুলতে খুলতে বললেন, এই গুমোরওয়ালা বাঁদিকে নিয়েই আমার গোটা সংসার গো!

—আমার গুমোর ?

নলিনী যেন প্যাঁচে ফেলেছেন সুরবালাকে। বললেন—নিম্ন আদালতের চটক উকিলের মতো, তুমি কি বাঁদি ?

এভাবে চলতেই থাকবে দেখে সুরবালা উঠে গেলেন। নলিনী বললেন, আরে বসো না।

—আমার কোনো কাজ নেই ? স্যাঁকরার দোকানে যেতে হবে বিকেলে।

—স্যাঁকরার দোকানে কেন ?

—বাঃ রে! রেবার বিয়ে না ? পুরনো আংটি যেটা ছিল, বলেছিলাম পালিশ টালিশ করে পাথরটা যেন শুধু পাল্টে দেয়।

কতজনকে কত আংটি দিলে। আংটির আড়ত আছে নাকি তোমার ? আর কতটা আছে ?

—আর নেই। ওটাই শেষ। আঙুলে যেটা দেখছ—সেই প্রথমদিন তুমি দিয়েছিলে। ওটা তো দেওয়া যায় নায় রেবাকে কী-ইবা দিই ? কাকে বলব ? আংটিটায় মরচে পড়ে যাবে। এর চেয়ে রেবাকে দেওয়া অনেক ভালো, কী বলো ?

—সোনায় মরচে পড়ে না গো সুরবালা কোনোদিন।

সুরবালা নলিনীর ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ ও ধ্বনির মহিমায় গেলেন না। বললেন শান্তস্বরে, থালায় একছড়া হার আছে আর কয়েক গাছা চুড়ি। চুড়িগুলো বুম্বার বউ নেবে। আর হারছড়া তুলির।

এক পলক দেখলেন নলিনী সুরবালাকে।

সুরবালা বললেন, গেঞ্জি খোলো। বাথরুমে যাও। জল দিচ্ছি। ঠান্ডা জল ছোঁবে না।

নলিনী তখনো দেখছেন সুরবালাকে। সুরবালা জানেন, মানুষটার মাথায় কখন যে কী চাপে! বললেন, কী দেখছ ?

—বাঁদিকে দেখছি।

—নতুনভাবে দেখার কী হল ?

একেবারে ভরাট স্বরে বললেন নলিনী, এমন বাঁদিরা আছে বলেই সংসার এখনো টিকে আছে।

—হয়েছে। জল ঠান্ডা হবে। চানে যাও অনুগ্রহ করে।

সুরবালা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। নলিনী বললেন, শোনো, রেবা রেবা করছ। রেবাটা কে ?

সুরবালা উঠোন থেকে বললেন, বাঃ রে রজনীর মেয়ে।

ঠিক এমন সময় প্রায় সহসা, ফেরিওয়ালার ক্ষীণ অথচ তীব্র ডাক শুনলেন নলিনী—লাগে, রঙিন চুড়ি, চুলের ফিতে, কাঠি লজেন্স।

এ ডাক পাড়ার শান্ত গলির পথে নয়। এ গলি একান্তই নলিনীর ভিতরে, অনেক ভিতরে। ডাক মিলিয়ে গেল একসময়। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল, তবু রেশ গেল না। এ রেশ কোনদিন যায় না।

নলিনী আবার ডাকলেন, শুনে যাও।

—কী হল আবার ?

—এসো না।

—ফোটানো জল উপচে স্টোভ নিভে গেছে।

—যাক। তুমি এসো তো আগে।

সুরবালা কী আর করেন। এলেন আবার ঘরে। বললেন, কী বললাম বোঝোনি ? কত

কাজ জানো ?

—হবে রে বাঁদি, সব হবে। কত না কাজ! শোও বিছানায়।

—কি।

—শোও না।

—কেন ?

—খাব তোমাকে।

—ভিমরতি।

—আরে ধুর। শোওতো।

নলিনী প্রায় জোর করে শুইয়ে দিলেন সুরবালাকে নিজের বিছানায়। বললেন, ব্লাউজ গুটোও। আমি আসছি।

—কী ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভরদুপুরে—বলেই উঠে পড়লেন সুরবালা।

নলিনী চাপা ধমক দিলেন—বললাম না, আমি আসছি। ব্লাউজটা, আর কিচ্ছু বললেন না, গেলেন ডাক্তারখানায়। সুরবালা প্রায় আতঙ্কিত গলায় বললেন,

—কী হবে। কী করবে ? ব্লাউজ গোটাব কেন ?

নলিনী লক্ষ করছেন পারদস্তম্ভ। স্তম্ভের পারদ উঠছে লাফিয়ে লাফিয়ে। পাম্পিঙে শব্দ হুস্ হুস্। সুরবালার বাঁ বাহুতে লেপ্টানো প্রেসারবেল্ট। ফুলে ওঠা রগে নলিনীর স্টেথোর সেন্সর। কয়েকবার দেখে বললেন, আমি যা ভাবছি তাই। তখন একটু টাল খেয়েছিলে তুমি।

—কী ?

—ডাইস্টোলিক হাই আছে বেশ। অষুধ খাচ্ছো তো রোজ ?

—কোন অষুধ ?

—কোন অষুধ মানে ? এডেলপিন এসিড্রেক্স ?

—ওটা খেয়েছি তো।

—কখন খেয়েছ ?

—এই তো একটু আগে।

—একটু আগে। তুমি জ্বালিয়ে খাবে দেখছি। সকাল আটটার ডোজ এখন খেলে ? তুমি কী বলো তো ?

নলিনী যন্ত্রপাতি গোটাচ্ছেন। বড় গভীরভাবে সুরবালা নিরীক্ষণ করলেন নলিনীকে। গলা একটু কেঁপেও গেল। বললেন, তোমার বাঁদি। এর বেশি আর কোনো পরিচয় নেই আমার।

—তোমার মাথা। ওঠো বাথরুমে জল দিয়েছে কেউ ?

উঠতে উঠতে সুরবালা বললেন, রোজ রোজ প্রেসার দেখো কেন বলো তো ? যত ডাক্তারি আমার ওপর।

একথাগুলো ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ নয়, নলিনী স্পষ্ট জানেন। এ অন্য কিছু এবং গভীর ও মহার্ঘ। তবু বললেন, খালি বিদ্রুপ, খালি বিদ্রুপ।

সুরবালা হাসলেন। একটু জোরেই বললেন, তখন কী মনে হয়েছিল জানো ?

—কী ? কী মনে হয়েছিল ?

একটু থেমে সুরবালা বললেন, ঐ যে বলছিলে, গোটাও!

—কী ?

আবার ধমকালেন সুরবালা।

কাপড় চোপড় ছেড়ে নলিনী স্নানের জন্যে তৈরি হচ্ছেন। বললেন, কী মনে হয়েছিল কী গোটাবে ?

—একেবারেই সদ্য যুবতির ভীষণ লজ্জা পাওয়ার মতো বললেন সুরবালা প্রায় ফিসফিসিয়ে, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। যাও চলে যাও।

এগারো

বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে সুরবালা সোজা গেলেন সরলার ঘরে। বরুণ ব্যাঙ্ক থেকে এখনো ফেরেনি। যখন বেরোয়, অফিসে দু-একজন সাব-স্টাফ আর নাইটগার্ড ছাড়া অবশিষ্ট কেউ থাকে না। ব্রাঞ্চের দৈনন্দিনের সব ঝামেলার পর যখন ফেরে তখন রাত নটা সাড়ে নটা। হারুর ফেরার ঠিক-ঠিকানা কোনদিন থাকে না। হাইওয়ের বড় বড় চার চারটে কালভার্টের ঠিকে। সিমেন্ট, রড, বিল, টেন্ডার, রি-ইনফোর্সমেন্ট চার/এক-ছয়/তিন, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার—এসবই সুরবালার কানে অহরহ ঢোকে।

সরলা শুয়ে আছে ডিভানে। চোখের সামনে মেলে ধরা ঝকঝকে একটা সাময়িক পত্রিকা, মহিলাদের। সুরবালাকে দেখেও সে উঠল না।

সুরবালা বললেন—সাধনা কোথায় বউমা ? (সরলাকে বউমা বলেন, সাধনাকে নাম ধরে) পাতা উল্টাল সরলা আরো কয়েকটা। বলল, কেন ওর রুমে পাননি ?

—মনে হল নেই। আলো নেই ঘরে। কোথাও বেরিয়েছে ?

—হতে পারে।

—বুম্বা, তুলি ?

—ওরা বিয়েতে গেছে।

—রেবার বিয়েতে ? দেখলাম না তো ওদের।

—ওখানে কেন যাবে ?

—ওখানে যাবে না কেন ?

—আপনি তো গেলেনই। একজন গেলেই হল। লক্ষণকে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি। বাড়ির হয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করে আসবে।

—লক্ষণকে নেমন্তন্ন রক্ষা ? কী বলছ বউমা ?

—রায়তবাড়িতে এর বেশি কী দরকার ? আপনিও তো গেলেন।

—সুরবালা আহত হলেন। বললেন, বউমা, কী বলছো তুমি ? রায়ত-টায়ত আজকাল এসব

আছে নাকি ? রজনী আমাদের ঘরের লোকের মতো। মতো কী ? ঘরেরই।

সরলার দ্বিধাহীন জবাব, হলেই বা প্রজা প্রজাই।

—চুপ করো তুমি। কে রাজা কে প্রজা কী হাস্যকর কথা বলছ ? রেবাকে এই ছোট্ট পেয়েছি আমরা। তোমার শ্বশুর ওদেশ থেকে ছুটে এসে ওদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আশ্রয়ই তো।

সরলা চোখ বোলাচ্ছে কী করে মাংসের স্টু রাঁধতে হয়। এগ পুডিঙের সব সামগ্রীর অনুপাত কতটুকু। আবার কখনো দেখছে বিজ্ঞাপন—কোন ধরনের অন্তর্বাসের ফাইবারের ফিদারটাচ ফিলিংস কতটুকু। কোল্ডক্লিনসিং ক্রিম এপিডার্মিসকে ঠিক কতটা..... রাখে।

সুরবালার কথায় তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। বলল, বাবাকে চা দিয়েছিল লক্ষণ, বলেছে চিনি বেশি। আমি দিইনি। এত মাপজোখ হবে না আমার দ্বারা। একটু আগেই বলেছেন, এক কাপ চা নাকি চাই।

সুরবালা ফ্রিজ খোলার আগেই সরলা জিজ্ঞেস করল, কী রাখবেন ?

—মিষ্টি। জবা রজনী নিজে রেঁধে দিয়েছে তোমাদের জন্যে।

—ফ্রিজে জায়গা নেই। পুরোপুরি লোড হয়ে আছে। হারু নানান সবজি হরিণের মাংস পাঠিয়েছে বানোয়ারিকে দিয়ে।

সুরবালা ফ্রিজ খুললেন না। বললেন, এতগুলো মিষ্টি। আমি বার বার না না করেছি। রজনী নিজে বয়ে এনে দিল গেট অবধি। বিয়ে বাড়িতে তাড়া আছে বলে চলে গেছে। আমি কত না, না করলাম। মানেই না। ম্যাগাজিন সরিয়ে রেখে উঠে বসল সরলা। ইলেকট্রিকের রেডিও বাজছিল ঘরে। শর্ট ওয়েভে ভাসা ভাসা সুর আসছে কোনো দূর স্টেশন থেকে—'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।' সব সুরকে বিস্মিত করে সরলা বলল, আপনারও কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই মা। বাবা তো অনেক আগেই হারিয়েছেন।—শর্ট ওয়েভের মালতী ঘোষাল তখনো ঘরের আপাত ভঙ্গুর হাওয়ায়।

ভেতরে ভেতরে পুরোপুরি ভেঙে গেলেন সুরবালা। কিন্তু সুরবালা সুরবালাই। আবার একে একে জুড়ে দিলেন অভ্যন্তর। বললেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে, যারা পেছন ভুলে যায় বউমা, তাদের সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই থাকে না। একথা যদি পারো মনে রেখো। বলেই আর কোনো অপেক্ষা ও প্রত্যাশার স্পৃহা নিজেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, প্রয়োজনে ক্ষমাহীন ও কঠিন পারুলবালার মা সুরবালা, তর তর নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। সরলার মতো পল্‌কা অস্তিত্ব দাপট সইতে পারল না। সুতরাং কিছুই উচ্চারণ করতে পারলেন না জবাবে।

সরিয়ে রাখা ম্যাগাজিনে কৌতুক নক্সার প্যাস্টেল স্কেচ—হাসি নয় এক রমণীর মুখ ওর দিকে চেয়ে রইল পলকহীন। আর প্রসারিত দামি আসবাবপত্র সম্বলিত সরলার ঘরের আনাচে কানাচে হাল্কা অথচ ভরাট স্বর আগের গান মালতী ঘোষাল আর রবীন্দ্রনাথ।

নিজেদের ঘরে টেবিলের উপর বড় প্যাকেটটা রেখে চুপচাপ বসে রইলেন বিছানায়। লক্ষ করে নলিনী বললেন, ওটা কী গো ?

সুরবালা জবাব দিলেন না। নলিনী আবার বললেন, কী হল ? ক্লান্ত লাগছে ?

—না।

—ঠিক আছে। কী ওটা ?

—মিষ্টি।

—মিষ্টি ? কে দিল ? নিশ্চয় রজনী জবা বিলাস দিয়েছে। আমাকে দাও না একটু।

—তুমি খাবে ?

—খাব না কেন, আমার তো সুগার ফুগার নেই।

—তা নয়।

—তবে !

—রায়তের মিষ্টি তুমি খাবে ?

—কী!

—কী আবার ? রায়ত। মিষ্টি। রজনী।

—রজনী রায়ত! কী হয়েছে বলো তো ? কী হয়েছে তোমার ?

নলিনী এবার ভালো করে লক্ষ করলেন, সুরবালার ফর্সা মুখ টকটকে লাল। তীক্ষ্ম নাকে দুদিকে একটু ফোলা। কপালে কুঞ্চন। নলিনী সুরবালার মেজাজ বোঝেন। জানেন, এ মানুষটার অহেতুক বা স্বল্প কারণে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।বললেন, কী গো, কী হয়েছে ?

—কিচ্ছু না। চায়ে মিষ্টি একটু বেশি হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ?

—কী বলছ একনাগাড়ে আবোল তাবোল। কিছুটা সময় এমনি শব্দহীন কাটে।

একসময় সুরবালা বললেন, রাখো, আমি চা করে দেই।

—একটু মিষ্টি দিও। রেবার বিয়ের মিষ্টি। মাথাধরা ভীষণ সকাল থেকে জানোই তো, না হলে অবশ্যই যেতাম। রজনী, জবা খারাপ পায়নি তো ?

—জানি না।

নলিনী বুঝলেন একটু আগে সুরবালা উগরে দিয়েছিলেন। ওখানেই যত বিভ্রাট হয়েছে। কী আর করা যাবে, মহিলাদের ব্যাপার।

সুরবালা যখন চা নিয়ে এলেন, তখন নলিনী নিজেই মিষ্টির প্যাকেট খুলে ফেলেছেন। বললেন, একী করেছে রজনী জবা!

—কেন, কী হয়েছে ? কত যত্ন করে দিল।

—তা নয়, বিয়ে বাড়ির পুরো মিষ্টি তুলে দিয়েছে গো! কী কান্ড দেখো। রজনী-জবা চিরটাকাল একই রকম রয়ে গেল। এত বড় মন ওদের। ছোট খাটো ব্যাপারেই বোঝা যায়, জানো ?

—বড় আপনজন এরা। পিরিচে কয়েকটা মিষ্টি তুলে দিলেন সুরবালা।

নলিনী বললেন, সবাই খাবে। ফ্রিজে তুলে রেখে দিও। অন্য কেউ এলেও দেওয়া যাবে। রেবার বিয়ে বলে কথা।

সুরবালা মনে মনে বললেন, ফ্রিজে রাখতে দিল না রায়তের মিষ্টি। মুখে বললেন, ফ্রিজে জায়গা নেই। ওতে হরিণের মাংস। আমি রাখব যত্ন করে। তুমি ভেবো না।

—বরুণকে দিও। ও মিষ্টি ভালোবাসে।

সুরবালা আবার মনে মনে বললেন, বরুণের বউ এ মিষ্টি খেতে দেবে না। মুখে বললেন, খাবে। সবাই খাবে। কাল যে আসবে তাকেই দেব। তুমি খাও।

চায়ে চুমুক দিয়ে নলিনী বললেন, তুমি বলেছ, কাল কনে বিদায়ের আগে তুমি-আমি যাব ?

—বলেছি।

—আশির্বাদী আলাদা করে রেখেছি। কাল মনে করে নিও তো। দেখো তুমি বেশি কান্নাকাটি করো না যেন। কথাগুলো বলতে বলতে নলিনীর নিজের স্বর ভার হয়ে এল। বুকের একপ্রান্ত অন্যপ্রান্ত অবধি জোর হাঁক দিল সেই ফেরিওয়ালা 'লাগে চুলের ফিতে, রঙিন চুড়ি....।'

সময় সময়ের মতোই গড়ায়। এক সময় সুরবালা বললেন, রেবাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

নলিনী বললেন, দেখাবেই তো। রজনীর মেয়েটা সত্যি সুন্দরী। ভালো ছেলে পেয়েছে রজনী। রেলের চাকরি কত ভালো। অনেক দেশ বিদেশ দেখবে মেয়েটা।

সুরবালা ভীষণ অন্যমনস্ক। শুধু বললেন,—হুঁ।

সময় সময়কে কাটে এখন। জিওলমাছের মতো...স্মৃতি—সুরবালা ও নলিনীকে। তবু ঘুরে ফিরে আবার রেবার কথাই বলেন সুরবালা, আমার মন ভরেনি জানো ?

—কেন ?

—মাত্র আড়াই আনার একটা আংটি দিয়েছি মেয়েটাকে ? আর কার কাছে চাই বলো তো ? তোমার অবস্থা তো অজানা নয় আমার। হারটা দিলে ভালো হত। কিন্তু ওটা যে তুলির জন্যে পণ করে রেখেছি অনেক আগে। একজনের জিনিস কি অন্যজনকে এমনি বিলিয়ে দেওয়া যায় ? কাল যা আছে সব টাকা নিও তো—বলে সুরবালা তাকালেন নলিনীর দিকে।

ঘরের স্তিমিত আলোয় দেখলেন, সুরবালার দুচোখ ভরা দীঘির মতো টলটল। গড়িয়ে পড়ে দুই গালে। সুরবালার কাঁধে আলতো হাত রাখলেন নলিনী। বললেন গভীরস্বরে, এই যে চোখ ভেজালে, এটাই কি কম দেওয়া ?

সুরবালা কোনো কথা বললেন না। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন। বসে রইলেন দুজনে বাক্যহীন। কে কাকে কী বলবেন ? বেশি বলার যদি থেকে যায়, শব্দে বাক্যে সব গুছিয়ে বলা অবান্তর! তাই চুপচাপ বসে রইলেন দু'জনে। গেটে শব্দ হল। কী সব বলতে বলতে এগিয়ে আসছে এক পুরুষ ও মহিলা। কণ্ঠস্বর উচ্চারণ জড়ানো।

দুই-জোড়া পা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে বোঝা যায়। এলেবেলে হাসির পরিচিত শব্দ সাধনার। হারু আরো কী কী বলছে। আবার বেসামাল হাসি।

দুজনেই টের পেলেন—সাধনা-হারু এ মুহূর্তে শালীনতা শিষ্টাচার ঝেড়ে ফেলেছে। মদ খেয়েছে দু'জনেই।

ওপরের তলা সরগরম এখন। বুম্বা, তুলি ফিরে এসেছে। বরুণ ফিরেছে বেশ আগে। সরলা ধমকাচ্ছে। শ্রান্ত অবসন্ন ব্যক্তিত্বহীন ভালো মানুষ বরুণ কোনো কিছু আনতে হয়তো ভুলে গেছে। সাধনা জোরে ডাকছে সরলাকে—দিদিভাই ও দিদিভাই মজা দ্যাখো।

সরলার জবাব, আসছি। কী হল তোদের আবার।

নির্বাক সুরবালা একসময় বললেন, তুমি বসো। আমি আসছি। ভাতটা বসাই।

নলিনী বললেন, না বসো তুমি। আজ প্রেসার কুকারের ভাত খেয়ে নেব। লক্ষণ করে দেবে।

সুরবালা প্রতিবাদ করলেন, না না। পেট ব্যথা হয় তোমার। আমি আসছি।

সুরবালা নলিনীর আরো কিছুটা বয়স বেড়েছে। তারা নিজের নিয়মে আরো কয়েক পা হেঁটেছে। আবহাওয়ার গড় তাপমাত্রা দিন দিন বিন্দু বিন্দু করে বাড়ছে। দুটো মেরুর বরফ গলার মাত্রাও বাড়ছে। দক্ষিণ চীন সাগরে আর বঙ্গোপসাগরে ভীষণ ঝড় ওঠে ইদানীং। শীত-গ্রীষ্ম কোনো ঋতুই মানে না। কয়েক লক্ষ লোক পূর্ব পাকিস্তানে মারা গেল ঝড়ে। এমন ঝড় পুরো একটা জাহাজকে সাগর থেকে চোদ্দো মাইলের দূরত্বে আছড়ে ছুড়ে ফেলেছে সমুদ্র ঢেউয়ে এক টন ট্রাক লটকে আছে এক বড় গাছের মগডালে। ট্রাকের খোলা দরজায় তখনো ঝুলছে চালকের বাসি লাশ। নলিনী ছবিতে দেখেছেন।

বুম্বা-তুলি আরো কিছুটা বড় হয়েছে। তুলির শরীরে যৌবনের রেখা উপরেখা ফুটেছে অনেক আগে। দেহ ও ত্বকের চর্চায় মগ্ন থাকে অনেকক্ষণ।

অনেক আগেই দাড়ি গোঁফ চেঁছেছে বুম্বা। গলার কণ্ঠস্বর ভেঙে এখন বেশ ভার ভার। চুলে নানা কেরামতি করে। আয়নার সামনে তেরছা দাঁড়িয়ে মুখের প্রোফাইল দেখে আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, তার ডানদিকের চেয়ে বাঁদিকে মুখের অ্যাট্রাকশন বেশি ও সেক্সি। বুম্বা 'ক্লীন শেভ' থাকে। শেভ করে মিষ্টি কাকার 'আফটার শেভ' গালে গলায় চাপড়ায়। তবু চোখের কোণে হাল্কা কালি বুম্বার সঙ্গত কারণে। একটা মেয়েকে 'লভ লেটার' দেওয়ার খুবব ইচ্ছে হয়েছিল। দুছত্র ইংরেজি বা বাংলায় নিজে গুছিয়ে লিখতে পারেনি। তাই তুলিকে বলেছিল লিখে দিতে। তুলি বলেছিল, নিজের কথা নিজে লিখে নে, ইডিয়ট।

অসহায় জবাবে বুম্বা বলেছিল, শঙ্করদাকে যা লিখে দিস্ তুই, ওগুলোই বলে যা না, আমি লিখে নেব।

—শঙ্করকে একটাও চিঠি দিইনি তো আমি।

—ওকে কি দিস তুই ?

একটু চাপা হেসে গর্বিত তুলি বলেছিল—তোকে বলব কেন ? ওর চিঠি লাগে না।

একরোখা বুম্বা অন্য উদ্যম নিল। বলল, মিষ্টি কাকিকে বললে লিখে দেবে না ? ওর খুব এক্সপিরিয়েন্স মিষ্টিকাকাকে নাকি অনেক লিখেছে একসময়।

—ট্রাই করে দ্যাখ। দেয় তো ভালই। তা কাকে চিঠি দিবিরে, সুপর্ণাকে ? সাবধান মেয়েটা ত্যাঁদর আছে। বুঝে সুঝে সামাল দিস। কয়েকজনকে পাউরুটি বানিয়েছে।

বুম্বা ট্রাই করেছিল। সময় নেই বলে সাধনা দেয়নি। যদিও সাধনা ও বুম্বা ডুয়েট গায় প্রায়ই —'জিস গলী মে তেরা ঘর/গো বালমা/ উস গলী সে হমেঁ তো গুজরনা নেহি'।

ডুয়েট ডুয়েটের সময়। চিঠি ফিটির জন্যে বাজে সময় একদম নেই। সাধনা পি ডব্লু ডির ডিভিশনাল অফিসের 'কামচোর' এল ডি। ঐ অফিসেই হারুর সাথে পরিচয়, তারপর সবকিছু।

বাইরে আর কোথাও চেষ্টা করেনি বুম্বা, ভরসা পায়নি। সুতরাং চিঠি দেওয়া হয়নি।

আসলে, সুপর্ণা সম্ভবত বুম্বার হস্তলিপি বানান ও বাক্য ঠিকঠাক ফ্রেস করতে পারে কিনা, কিংবা কতটা বোকাটে ধরনের সেটাই 'অ্যাসেস' করতে চেয়েছিল। সুপর্ণা বুম্বার চেয়ে বয়সে একটু বড়। ওর মগজেই দাঁড়িপাল্লা, ফিতা, গেজ, মাইক্রোমিটার সব আছে। মুহূর্তে মাপজোখ করে নেয়, কোন 'মুরগা' কতটা ধান খেতে পারে ও হজম করতে পারে।

বুম্বা চিঠি জোগাড় করতে পারেনি। অতএব 'লভ লেটার' সাবমিট করা হয়নি। বানান হস্তলিপি যাচাই হয়নি। পরীক্ষা হল না, তো পাশ করবে কি বুম্বা ? সুপর্ণা পুরোপুরি হতাশ করেনি বুম্বাকে। বলেছিল, মনে মনে, 'লড়ে যা বেটা, মঞ্জিল দূর নেহি'। মুখে বলেছিল, তুমি যদি ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেকটর হও কোনদিন, সেদিন কিন্তু সব সম্ভব। চেষ্টা করলে তুমি সব পারবে, আমার বিশ্বাস আছে।

বেচারা বুম্বা। ক্লাশ নাইনে এক হাজারের মধ্যে পেয়েছিল একশ বত্রিশ। মাধ্যমিকে একবার গাড্ডা খেয়েছে। মিষ্টিকাকীর সাথে ডুয়েট গেয়ে আবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যদি হার্ডল পেরোনো যায়। এরপর রইল কলেজ। কলেজের পর আরো কত কী করে টরে তারপর নাকি ইন্সপেক্টর ? ইনকাম ট্যাক্স। বুম্বা টের পেল—সুপ (ডাকনাম) টুপি পরিয়েছে। তাই একদিন একা পেয়ে করুণ অনুনয় জ্ঞাপন করল, এত বড় চাকরি আমি কোনো দিন পাব না সুপুদি। আরো একটু কমাও। হোমগার্ডের রেগুলার হাবিলদার ও তামাম চাকরি। ওতে হবে না ?

সুপর্ণার স্পষ্ট জবাব, না ওতে হবে না। সেই কবে থেকে ইনকাম ট্যাক্স আমার কী পছন্দ ? অন্যের লুকোনো টাকা ধরছে। নিজের লুকোনো টাকা কোথায় রাখছে কেউ বুঝছে না। তুমি পারবে। আমি জানি তুমি পারবেই।

বুম্বা ভ্যাবলার মতো বলল, কী পারব ?

—ইনকামট্যাক্স।

সেদিন বেশি জোর-জার করল সুপর্ণাকে, পরিচিত বিয়ে বাড়িতে পেয়ে গিয়েছিল একা। বুম্বা 'চান্স' ছাড়ল না। জাপটে ধরতেই সুপর্ণা ভীষণ আবেগে (কপট) বলল, বুম্বা গো, আমার না কোন ভাই নেই। আজ থেকে তুমি আর আমি কথা শেষ করতে না দিয়ে নির্যাতিত অথচ বলিষ্ঠ শ্রমিকের মতো তীব্র প্রতিবাদ জানাল বুম্বা।

—না না। তোমার মাসতুতো, পিসতুতো গন্ডাগন্ডি অনেকগুলো থার্ডক্লাস, গান্ডু-গান্ডু ভাই আছে আমি জানি।

বিয়ে বাড়ির ক্ষণিকের নিরিবিলি আর কত সময়ই বা নিরিবিলি থাকে। সুতরাং এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এখানেই ইতি পড়ে যায়। বুম্বাও সুপুর দেওয়া বেশ ভালো সাইজের 'টুপি'

পরে ফিরে আসে। মনটা 'ইনকাম ট্যাক্স' ও 'ভাইয়ের' মাঝখানে তাঁতের মাকুর মতো ছটাক পটাক করে। উদাস হয়, আর গান গায় — 'তেরে গলিয়োঁ মে হম রখেঙ্গে না কদম/ আজ কী বাদ — এ গানের কোনো কো- সিঙ্গার পায় না। সোলো গায়। কারণ মিষ্টিকাকির এসব গানের কোনদিন কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এখনো নেই। মিষ্টিকাকা কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোলে ছিল।

তারপর আস্তে আস্তে, সুপর্ণা নামে এক বেতালা মেঘ বুম্বা আকাশ থেকে উড়ে যায়। বুম্বার অন্য মেঘের তল্লাস জারি রাখে, যে মেঘে ইনকাম ট্যাক্সের স্পৃহা নেই।

নদীর স্রোত, পৃথিবীর ঘুর্ণন আর সময়ের গতিশীলতায় কোন বিরাম নেই। দিন যায়। সরলা সাধনা ওদের মতো আরো প্রস্ফুটিত হয়েছে। দুজন সম্পর্কে বোন। সম্পর্ক ফেলনা নয়। আগে দুবোনে খুব জেদাজেদি ছিল। এখনো যে নেই, তা নয়। জেদের জ্বরটা প্রবল হয় বিশেষ এক ঋতুতে। যেমন শরৎ। ঐ ঋতুতে পুজোর কাপড় কেনা হয়। বিয়ের আগে হারু বৌদিকে যে শাড়ি কিনে দিত, বিয়ের পরের শাড়িতে কিছুটা ফারাক এসেছে। মূল্যমান কমেছে সাধনার 'মেনিপুলেশনে'। ওদের দেওয়া শাড়ি সরলা চুপচাপ যাচাই করে নেয় দোকানগুলোতে এবং বড়ই কষ্ট দুঃখ ও যাবতীয় যাতনার আগুনে আবিষ্কার করে—যত দাম বলেছে সাধনা, শাড়িটার দাম তত নয়। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সরলার জ্বর বাড়ে ও আপৎকালীন জেদটাও বাড়ে। তারপর সরলা সাধনা, ওদের নিজস্ব প্রকৃতির নিয়মে সব জেদ ফিকে পড়ে, আবার অন্যমাত্রা নেয়, যা সারা বছরই থাকে। দুজনের সম্মিলিত জেদ তখন আরো তীব্র, ঘনীভূত, একমুখী অথচ ভীষণ অদৃশ্য। যেন ইনফ্রারেড লেসার বিম সদৃশ, অভিঘাত ছোঁড়ে অনেক পোড়খাওয়া, এক ভিন্ন মাপের ব্যক্তিত্ব সুরবালার দিকে। সুরবালা সব আঘাত সয়ে নেন। যেভাবে বিকট বজ্র ধারণ করে নয়ে মেদিনী। এত তুচ্ছ দুই আত্মকেন্দ্রিক ক্ষমার যোগ্য স্ত্রীলোক সরলা সাধনা। সুরবালাকে খন্ডিত করার মতো প্রবল আয়ুধ এই দুইজনের তূনীরে নেই। তবু, সুরবালা একটু বিচলিত হন কখনো, তাও নিজের জন্য নয়—নলিনীর জন্যে।

সমস্ত বজ্র নিজের শরীরে শুষে নিয়েও সুকঠিন সুরবালার ভিতর এদিক ওদিক দু এক ফালি আঁকাবাঁকা ফাটল দেখা দেয়। মোদিনীর মন ও মানুষের মনে হয়তো এখানেই প্রভেদ। সুরবালা একজন স্নেহশীলা নারী এ বোধ যদি কারো না থাকে—সুরবালা কাকেই বা বোঝাবেন জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাঠ।

বরুণ আরো কত ব্রাঞ্চে বদলি হয়েছে। মেরুন কালার অ্যাম্বেসেডর কিনেছে ব্যাঙ্ক লোনে। বসে বসে কাজ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাই ঘাড় গলা একাকার হচ্ছে।

পনেরো কুড়ি লাখের কম কোনো কন্ট্রাক্টে আজকাল আর টেন্ডার ভরে না হারু। ছোট ষ্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড কিনেছে—সাধনার আব্দারে। এ বাড়িতে দাঁড় করিয়ে রাখার আর জায়গা নেই বলে পাঁচটা বাড়ির পর ওর শ্বশুর বাড়ির পার্কে গাড়িটা রাখে রাত্রে। দিনেরবেলা, যখন বাড়িতে আসে কোনো কাজে, বাড়ির সামনে রাস্তার পাশে রেখে দেয়। সাধনা ঝামেলা করে, ধুলোয় গাড়ি ময়লা হবে। গাড়িটাকে ও বলে বিধবা। কারণ ফিনফিনে সাদা গাড়ির রং।

'সুরবালা ইস্যুতে' (দুজনে এশব্দগুলোই ব্যবহার করে) সরলা সাধনার এক বিবেক হীন

অ্যালায়েন্স। যখন কেউ ধরা পড়ে যায় ষড়যন্ত্রে, তখন নিজের দোষ অন্যজনের ঘাড়ে নির্দ্বিধায় চাপিয়ে দেয়। অ্যালায়েন্সের অ-স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র মূল্যহীন হয়ে যায়। কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগ মোটেও কাজে লাগান না সুরবালা। ওর সূচিকর্মে নিপুণ মানসিকতা সব ছেঁড়া-ফোঁড়া যতটা পারা যায় জুড়ে নিতে চায়। ওরা, অর্থাৎ সরলা-সাধনা সুরবালার মানবিক রিফু কর্মের মূল্য দেয় না তেমন। বরঞ্চ নিজেদের বিভেদের ফাটলে ওদেরই পরিচিত অন্য ধরনের অ্যাডেসিভে কোনোমতে জোড়াতালি দেয়। কারণ বাইরে-ভিতরে স্বার্থের এক জোড়া ঘোড়া ছোটে অবিরাম। সরলার জন্যে হারুর তরফে কৌশলগত উপহার ন্যাশনেল প্যানাসোনিক। ওতে শান্তি দেব, দেবব্রত, কণিকা, সুচিত্রা, পঙ্কজ, হেমন্ত, মহম্মদ রফি, মুকেশ, লতা, কিশোর, মান্না কতজন যে, কখন কোন সময় বেজে ওঠেন। সেই জোড়া ঘোড়া ছোটে একইভাবে বাইরে ভিতরে সর্বত্র।

সরলার চেয়ে সাধনা একটু বেশি সুন্দরী। এ ঘাটতি সরলা পুষিয়ে দেয় গলার স্বরে। শারদীয়ার লং প্লেয়িঙে আশা ভোঁসলের মাদক গান সরলার গলায় খেলে ভালো।

অন্য একদিকে দুজনে সমান সমান। সরলা সাধারণ বি.এ। সাধনার সোসিওলজিতে অনার্স ছিল। পায়নি। অন্যদিকে সাধনা একটু লটকে গেলেও ওর মতে, ওপরেই আছে। সমীকরণটা এরকম—বরুণ এম এস সি।

হারু বাঁদরের খোটা পাওয়ার মতো পিছলে - পাছলে উচ্চমাধ্যমিক। কিন্তু চারজন স্নাতক ওর কাছে যে কোনো মাইনেতেই শ্রম বিলায়। বরুণের তো আর নিজস্ব ক্রীতদাস বা শ্রমিক নেই। সরলা এমন ভাবে না অবশ্য। ওর ভাবনা, ব্যাঙ্কের সব স্টাফ বরুণের তলায় যখন কাজ করে, সুতরাং ওরও তো। আর টেলিফোন ? খয়েরি টেলিফোন কে দিল ? ব্যাঙ্ক।

এভাবেই বাটখারা পাল্টানো, দ্রব্যের পরিমাপ করতে করতে সুরবালা - নলিনীর রচিত সংসারে দিন যায়, বছর যায়।

নলিনীর ফুটো স্টেথোর রবারের নল চটচটে হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে কানে লাগিয়ে নিজের বুকের বাঁদিকে চেপে ধরেন আলতো। হৃদয়ের শব্দ পান। টের পান ঐ শব্দ এখানোও আছে। জোর করে সুরবালরও দেখেন। এখানেও একই শব্দ। তবু হৃদয়ের ধ্বনির সাথে মিশ্রিত হয়ে অনাহুত অন্য বাতাসের শব্দও কানে যায়। যে বাতাস বয়ে আসে বরুণ - হারু - সরলা-সাধনা - বুম্বা -তুলিকে ছুঁয়ে।

স্টেথোর সেন্সার কিছুটা সংবেদনশীলতা হারিয়েছে হয়তো, তাই এমন মিশ্রিত শব্দ আসে — এই বলেই নিজেকে, সুরবালাকে একান্ত নিজের মতো করে সান্ত্বনা দেন নলিনী। আর এভাবেই অসংখ্য মানুষ, পরিবার, সমাজ, কিছু রাষ্ট্র ও গোনাগুন্তি মহাদেশ নিয়ে ভূ-গোলক ঘোড়ে অবিরাম।

মধ্যপ্রাচ্যে ক্যাম্প - ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হব হব করে। যেমন রোজ রোজ পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদিত করে সরলা - সাধনা। বরুণ আর হারুণ শুধু স্বাক্ষর দেয়।

জাতির জনক মহাত্মাগান্ধি জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হল কিছু দিন আগে। নলিনী এ নামে ডাকেন না। বলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। এর বেশি নয়।

এদিকে হারু সময় পেলে এমন এক পার্টি অফিসে যায় বিশেষ এক বস্ত্র ধারণ করে, যে দলে কর্মীর চেয়ে ঠিকাদার বেশি—নলিনীর এমনই মনে হয়।

খবর শোনেন নলিনী রেডিওতে—জাপানে 'এক্সপো' মেলার প্রস্তুতি চলছে। এটাই নাকি বিশ্বের সর্বপ্রথম এত বড় মাপের টেক্‌নো ফেয়ার।

রাশিয়ার উৎসাহী বিজ্ঞানীরা 'লুনাখোড্' মুনট্যাক্সি চালিয়েছে চাঁদের ধূসর মাটিতে। 'রিমোট সেনসিং' শব্দটা কানে গেল তখন প্রথমবার। এই শব্দটা তো বোঝা হেল, কিন্তু সুপারস্টার মানে কী ? স্টার তো -আকাশে ঝিকমিক করছে। এই সুপারস্টার শব্দ দুটো সরলা সাধনা বুম্বা তুলি সবাই বলছে ইদানীং। আরো জ্বলজ্বলে কোনো নক্ষত্র আকাশে উঁকি দিল কি ?

নলিনী একদিন সুরবালাকে বললেন, রাতে যাবে ছাদে ?

—এই ঠান্ডায় ?

—কিছু হবে না। দেখব।

—কী দেখবে ?

—সুপারস্টার।

সুরবালা লক্ষ করছেন, যত দিন যাচ্ছে নলিনীর বয়স কমছে। বললেন, আচ্ছা দেখব। মাথায় একটা কিছু চাপলেই হল। বাপ মেয়ের এক রোখ।

—না গো, ও তাজমহল আর নিরক্ষরেখা দেখতে চেয়েছিল দেখা হয়নি।

সুরবালা কিছুই বলেন না। নলিনীর জন্যে একটু উদ্বেগ হয় বুকে। মানুষটা শিশুর মতো হয়ে যাচ্ছে। এমন বাড়তে থাকলে তো মুস্কিল। বলা তো যায় না, যদি আগেভাগে চলে যাই ! কার কাছে রেখে যাব এঁকে ? ঠাকুর, যেন একসাথে যাই।

নলিনী বললেন, জানো, কত নতুন নতুন মানুষের মতো আনকোরা নতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে। যেমন—এক্সপো, সুপারস্টার। আরো কত শব্দ এখন ?

সুরবালা বললেন, প্রদ্যুম্নকে চিঠি লিখেছিলে ?

—কী ?

—চিঠি।

—আমি কী বলছি তোমাকে ?

—এসব শুনে কী করব ?

নলিনী বিরক্ত। বললে, শোন না।

—আচ্ছা হল।

নলিনী বললেন, সময় নিজের প্রয়োজনে সব তৈরি করিয়ে নেয় মানুষকে দিয়ে।

—ওটাই তো স্বাভাবিক। আগে ছাল বাকল পরে ঘুরে বেড়াত সবাই। সময় পাল্টাচ্ছে। এখন কত ধরনের কাপড়চোপড়।

নলিনীর উৎসাহ বাড়ে। বললেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কী কী বেরুল জানো বেশি করে ?

—কী ?

—যুদ্ধে ব্যবহারের জিপ গাড়ি, আর মোটর সাইকেল।

সুরবালা পাশ ফিরলেন। বললেন, গাড়ি ঘোড়ার গল্প হারু বুম্বাকে শোনাও।

—আরে ধুর। শোনা না।

—বলো। শুনছি।

—এবারে যুদ্ধে কী ব্যবহার করা হবে জানো ?

—না।

—জেনে নাও।

সুরবালা নিরুৎসাহ। বললেন, বলো।

নলিনী পুরো ঘোরে আছেন যেন। বললেন, মিসাইল।

—ওটা কী ?

—সারফেস টু সারফেস, সারফেস টু এয়ার, এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু সারফেস, কত নমুনার যে মিসাইল ? তুমি জানো না ?

—না। দেখিনি তো।

—কী করে দেখবে ? আমিও দেখিনি। ছবি দেখেছি, আর পড়েছি নানান কাগজে, বইয়ে।

—কী হবে ওসব দিয়ে ? গাড়ি ঘোড়ার বদলে এখন লোকে ওসব চড়বে ?

নলিনী চটে গেলেন একটু। বললেন, কী যে বলো মাথামুন্ডু। এগুলো অস্ত্র ?

—কেমন অস্ত্র, তীর তরোয়াল ?

—আরে না না। আতসবাজির রকেটের মতো। কালী পুজোয় বুম্বা ছুঁড়েছিল ছাদ থেকে। সোজা পড়ল যেয়ে নবীনের ছনের চালে।

—তারপর বালতি বালতি জল। পা মচকে মলু আটদিন বিছানায়। এ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ। জাপানের বিরুদ্ধে ?

—আরে না গো।

সুরবালা রায় দিলেন, বুম্বার রকেটের মতো আতস বোমা নিয়ে যে যুদ্ধে যাবে, সে গোহারা হারবে। তুমি ভেব না। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো আমি ঘুমোই।

—আমি তো ঘুমোবার চেষ্টা করছি। তুমি উল্টাপাল্টা বলে চটাচ্ছ।

—আর চটাব না। ঘুমোও। আমার ঘুম পাচ্ছে।

নলিনী বোঝাতে চেয়েছিলেন প্রত্যেকটা মিসাইলে বিশেষ পরিমাণে 'ওয়ারহেড' থাকে। এই ওয়ার হেডের মারণ ক্ষমতা মারাত্মক। কেবল একটা মধ্যম মাপের মিসাইল গোটা পাড়া তছনছ করে দিতে পারে—লন্ডন স্ট্যাটেজিক ইনস্টিট্যুটের একটা আর্টিকেল পড়েছেন কয়েকদিন আগে রুশের ইংরেজি দৈনিকের ফোর্থ পেজে। কিন্তু কাকে বোঝাবেন ? নলিনীর মতে, যাকে বোঝাতে মন করে সেই যদি পাস ফিরে ঘুম ঘুম ভান করে।

নলিনী ডাকলেন, আস্তে—এই বাঁদি।

বাঁদি জবাব দিলেন না। নলিনী, আবার ডাকলেন, ও মহারানি।

তবু সুরবালা একই রকম। নলিনী আবার, ও হারুর মা!

কোনো সাড়া না পেয়ে নলিনী এক নাগাড়ে মিসাইল ছুঁড়লেন—ও হারুর মা, ও পারুর মা, ও সরলা-সাধনার দজ্জাল শাশুড়ি, শোনো না!

সুরবালা তেমনি আছেন। একটু সময় নিয়ে নলিনী ডাকলেন, চলে গেলে, না আছো এখনো ?

ওপাশে মুখ রেখেই বোঁজা চোখে সুরবালা বললেন, হালকা নয় আবার ভারও নয়, তেমন গলায়, চলে গেলেই বাঁচি। কিন্তু তোমায় ফেলে যাই কী করে ?

একটু সময় নিলেন নলিনী। বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গেলেন সুরবালার বিছানায়। বসলেন সুরবালার পাশে। সুরবালা একইভাবে আছেন। নলিনী বললেন, একেবারে নেমে যাওয়া, কাঁপা কাঁপা গলায়, বিশ্বাস করো, মন থেকে বলিনি। তোমায় এমন বলতে পারি আমি ?

সহসা গলা আরো কেঁপে গেল নলিনীর। ডান হাত রাখলেন পাশ ফেরা সুরবালার ডান বাহুতে। আর বললেন, তোমায় ছুঁয়ে বলছি, ফুলটুসির দিব্বি। মন থেকে বলিনি। মাথার ঠিক নেই, কী যে কখন মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। দেখো না, কারো সাথে কোনো কথা বলি না তুমি ছাড়া। কেউ যদি রেগে যায় এই ভয়ে। তুমি তো রাগবে না। ও লক্ষ্মী (নলিনীর গোপন ডাক) ?

এবার নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না সুরবালা। পলকে উঠে বসলেন। দু চোখে অঝোরে জল গড়ায়, গালে গড়ায়। বলেন, প্রায় ফুঁপিয়ে, আমি জানি গো। এই ডাক্তার আমায় কী বলতে পারে, কী পারে না। তোমাকে নিয়ে আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা যে। বলেই আবার উপুড় হলেন বালিশে। ফিস্‌ফিস্ কান্নামিশ্রিত শব্দে আরো কী কী বলেন শুনতে পেলেন না নলিনী।

নলিনী একসময় উঠে এলেন আবার নিজের বিছানায়। টেবিলে রাখা গ্লাসের জল খেলেন একটু। শুয়ে পড়লেন টানটান।

সুরবালা তখন নলিনীর উপর মশারি টাঙিয়ে গুঁজে দিচ্ছেন তোষকের কিনারায়। নিজেকে ভেঙে ভেঙে, চূর্ণ বিচূর্ণ করে, নিজেরই অতীত মাড়িয়ে এগোয়। এগিয়ে যায়।

সুরবালা-নলিনীর দিনযাপনে বেলা গড়ায় ক্রমান্বয়ে।

বুম্বা 'ইনকামট্যাক্স' ও 'হোমগার্ডের স্থায়ী হাবিলদার' ভুলে টুলে ক্রীড়া কৌশলে মনোনিবেশ করে। হারুর উৎসাহে ফুটবলের মাঠে যায়। লক্ষ্য অনেকদূর—পেলে, বেকেন বাওয়ার। এতটা না হলেও চলবে। এদেশের ফুটবলের উল্লেখযোগ্য কে এখন তেমন জানা নেই বলে সম্মুখে কোনো আদর্শ স্থাপন করতে পারল না। তবু আদর্শহীনভাবেই উদ্যোগী মনোরথে মাঠে বল নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিল। শুনেছে—ভালো খেললে ভালো চাকরি। আর ভালো চাকরি মানেই তো ভালো ভালো মজাদার চটপটি, অনেক সুপর্ণা।

যা, ভেবেছিল, হল উল্টো। কোমর ভাঙা বুম্বাকে মাঠ থেকে তুলে আনল কয়েকজন বাড়িতে। বাড়ি থেকে ডাক্তারের পরামর্শে সোজা মেডিক্যাল কলেজের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের সাত নম্বর বেডে ট্র্যাকশন প্লাস্টার সহ দেড়মাস অব্দি ত্রিভঙ্গ মুরারি।

পরে হারু মাঠের কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিল, কী করে এমন হল রে বদু ?

বুম্বার বন্ধু বদু বলল, কতবার মানা করেছি আমরা।

—কী মানা করেছিস ?

—ব্যাকভলি মারিস না। পারবি না। দু-চার বছর প্র্যাকটিস না দিলে পারবি না। মানল না কাকা।

—তোরা জোর করে দিলি না কেন ?

—দিয়েছি কাকা, দিয়েছি। বলল পারব। তাগড়া আছে তো। আমায় বলল—কীক্ মার। আমি মারলুম বুক বরাবর। ব্যাকভলি করল বুম্বা। পারল না। লাড্ডুর মতো পড়ে গেল কাকা।

হারু কী আর করে। বোঝাল, ওকে আর এমন করতে দিস না তোরা।

বদু হারুকে আশ্বস্ত করল, ও আর ফুটবল খেলবে না কাকা কোনোদিন।

রেডিওয় খবর শোনেন নলিনী—নেলসন ম্যান্ডেলার আদর্শে অনুপ্রাণিত দক্ষিণ আফ্রিকায় গণ আন্দোলন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতো ভলকে উঠছে। কালো নিগ্রো নেটিভদের শিয়াল কুকুরের মতো গুলি করে মারছে দক্ষিণ আফ্রিকীয় সদাবর্ণ পুলিশ, সামরিক বাহিনী।

এই নেলসন ম্যান্ডেলা নাকি গান্ধির অনুরক্ত। এখন কারাবাসে আছেন, সেই ১৯৬৩ সাল থেকে।

কত খবর। খবরের কি শেষ আছে ? পৃথিবীর আনাচে কানাচে কত খবর। সবখানে রেডিওর লোক, কাগজের লোক যেতে পারে কি ? বড় বড় গোবদা গোবদা খবর আসে শুধু। চারু মজুমদারকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাঁপানির রোগী মানুষটা। জীর্ণ চেহারায় এত আগুন। বেটনাসোলের ডোজ মানুষটা নিতে পারছে কী ?

আরো খবর, হো-চি-মিন সাইকেলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান নিজেদের সুরক্ষিত অঞ্চলে। মাইলাই গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ইয়াঙ্কি ফোর্স। নারীর এমন ব্যাপকহারে অবমাননা আর কোথাও হয়নি। এ খবরগুলো বেশি আসে 'রেডিও পিকিং' থেকে।

এত ক্ষমতা ওদের ট্রান্সমিটারে, নলিনীর মনে হয় ড্রাইসেল ছাড়া রেডিওতে ঐ পিকিং শোনা যাবে। চীনের নামে দোহাই দিয়ে কত তাজা প্রাণ এখানে ঢলে গেল, অথচ 'রেডিও পিকিঙে' এক ফোঁটা শোকচিহ্ন নেই। ওরা জানে না এখানে এদের এত কমরেডস্। খবর আসে—আমেরিকান সেভেন্থ ফ্লিট ভিয়েতনামের উপকূলে জমে বসেছে অনেক বছর থেকে। এও টের পাচ্ছে—ভিয়েতনামী গণজাগরণের সামনে এ নৌবহর কিচ্ছু নয়। পলকে উড়ে যাবে। গণজাগরণ কী আমেরিকা পরখ করছে। নলিনীর বিরক্ত লাগে যখন শোনেন দু একটা হেডলাইনের পর এখানকার রেডিওতে 'ওয়াটার গেট স্ক্যান্ডেল, ওয়াটার স্ক্যান্ডাল'। নিক্সনের ওয়াটার গেটের চুয়ানো জলে এই উপমহাদেশের ঠিক কতটা জল দূষিত হবে—নলীনী ভেবে পান না।

অন্যের কেলেঙ্কারি নিয়ে এত চেঁচামেচি কেন ? এদেশে কি কোনো স্ক্যান্ডাল নেই ? অনেক আছে, জানা যায় না এই যা। একদিন যাবে হয়তো। দেশ বিভাগটাও তো একটা নির্মম স্ক্যান্ডেল—একা একা যখন বসে ভাবেন, নলিনীর তাই মনে হয় তীব্রভাবে।

মিউনিখ অলিম্পিকের জোর প্রস্তুতি চলছে। কোন এক মার্সস্পীজ নাকি সাঁতারে হইচই ফেলবে।

[illegible]

সেদিন নতুন এ বাড়িতে এসেই সুরবালা ও আমার জন্যে অ্যালট্ করে দিল সাধনা এই গুমোট ঘর—সেদিনই বুঝলাম —পারুল আর সাধনা এক নয়। এ ঘরে জানালা কেবল একটাই রে।কষ্ট হয় গুমোটে। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। বোঝা উচিত ছিল—মানুষ মানুষই। সে তো উট নয় যে নিজের শরীর নিঙড়ে তৃষ্ণায় জল খাবে। মানুষ অন্য মানুষের কাছে জল চায়। তেমনি জল চেয়েছিলেন তোদের মা তোদের বউয়ের কাছে। সুরবালার প্রত্যাশা গুরুত্ব পায়নি।

তবুও কোনো ক্ষোভ টোভ নেই বিশ্বাস কর। তোরা মিলেমিশে থাক। শুকনো আশীর্বাদ দিতে পারি তোদের কতটুকু কাজে লাগে জানি না। আমাদের দুজনের সম্মিলিত আয়ুও তোরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে নে। আর তো কিছুই দেওয়ার নেই এই বুড়োবুড়ির।

এভাবেই নানান ভাবনায়, যাতনায় নির্ঘুম রাত কাটে নলিনীর। আরো কিছুটা দিন, শুকনো পাতার হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার মতো, সরে গেছে।

সুরবালার বুকের বাঁদিকে চাপ-চাপ অনুভব হয়, কাউকে বলেন না। প্রেসারও বাড়ে। রোজকার ঔষধ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখে এই যা।

বড় ডাক্তার একবার দেখানো হয়েছে। বরুণ নিয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নানান ঔষধ ও পথ্য যেমন, নো সল্ট, নো ফ্যাট—এসব লিখে দিয়েছে বড় ডাক্তার।

বরুণের বড় আকারের ডাক্তার বেশি বড় নয়। চার ফুট এগারো ইঞ্চি। সাদা হাফ সোয়েটারের তলায় গলাবন্ধ শার্টে টাই পরেছে জংলাছাপ। প্রেসক্রিপশন প্যাডে ডাক্তারের নামের পাশে প্রায় এক লাইনে ডিগ্রি ছাপা আছে। কোনটা ডিগ্রি, কোনটা ডিপ্লোমা, কোনটা এমনি সাধারণের বোঝার উপায় নেই। সুরবালাকে বলেছিল, চর্বি জাতীয় খাদ্য খাবেন না। নুন একদম খাবেন না।

সুরবালার কেন যে ডাক্তারকে দেখে মজা লাগছিল। বললেন, সব্জিতে চর্বি আছে নাকি ডাক্তারবাবু ?

—না, আমি মাছ মাংসের কথা বলছি।

—ওসব আমি খাইনি কোনদিন। মাছ খাই না প্রায় কুড়ি বছর। কিন্তু একটু নুন ছাড়া তো খাওয়া যায় না ডাক্তারবাবু। কোন ব্যঞ্জনে নুন দেওয়া যায় না বলুন তো ?

ডাক্তার একটু থমকে গেল। বয়স বেশি নয়, বড়জোর তিরিশ একতিরিশ। শব্দভান্ডারে ব্যঞ্জন নেই। পায়নি আগে। ধরা দিল না। বলল, যে কোন ব্যঞ্জনে নুন আর ফ্যাট কম দিয়ে খাবেন।

বরুণ বুঝল, মা একটু মজা করছেন পারুলের ধাঁচে। আরো করতে পারেন। বলল, ওকে ডক্টর, প্রয়োজনে আপনাকে ফোনে পাওয়া যাবে তো ?

বড় মাপের ছোট আকারের ডাক্তার খুব ব্যস্ত। বলল, ফোনে পেতে হলে রাত সাড়ে নটার পর। তবে ফোনে প্রেসক্রিপশন অল্টার করি না। পেসেন্ট দেখতে হবে।

—ও কে, থ্যাঙ্কু।

নলিনীকে বলেছিলেন, সুরবালা। দু'জনে হেসেছিলেন।

নলিনী বলছিলেন, তোমার সূক্ষ্ম মজা ডাক্তার বোঝেনি। হঠাৎ এমন করতে গেলে কেন ?

সুরবালা হেসে বললেন, সোয়েটারের তলায় ডাক্তারের জংলা টাই দেখে হাসি পেয়ে গেল।

নলিনী কাগজ পড়ছিলেন। বললেন, তুমিও বালিকা হচ্ছ দিন দিন। এবার বালককে এক কাপ চা দেবে ? মাথাটাথা ঘুরছে না তো ?

—দিচ্ছি। মাথা ঘুরবে কেন ? বরুণের চিন্তা বেশি, তাই গেলাম।

নলিনী তাড়া দিলেন, প্রেসক্রিপশনটা কোথায় ?

—বরুণের কাছে।

—কেন ?

—বলছিল কাজ আছে।

—অষুধ কেনা হয়েছে ?

—হ্যাঁ, এই তো।

—ওহো বলে হাসলেন নলিনী।

সুরবালা বললেন, হাসছ কেন ?

—মায়ের নামে মেডিক্যাল বিল করবে তোমরা বরুণচন্দ্র।

বারো

ইজিচেয়ারে বসে আছেন অনেকক্ষণ থেকে। চেয়ারের কাপড় বেশ ঢিলে হয়ে গেছে। বাঁদিকের ফ্রেমে পাতলা চিড়। বাড়ি বদলানোর সময় আছড়ে ফেলেছিল কুলি। তখনই হয়তো চিড়টা ধরেছে। গিরিধারী বানিয়ে দিয়েছিল সেই কবে। বলেছিল, কর্তা, বইস্যা আরাম পাইবেন।

—কত খরচ পড়ল গিরি ?

—কী কন কর্তা ?

—বলছি খরচ।

একটু থমকে যায় গিরিধারী। কী বলছেন স্পষ্ট হলেও অস্পষ্ট ওর কাছে। বলল, খরচার কথা কেন কর্তা ?

সামান্য জিনিস আপনারে দিতে পারি না ?

—পারো। তবু। তোমার অবস্থা তো আমার অজানা নয়।

বারান্দায় মোড়ায় বসেছিল গিরিধারী। সুরবালা চা দিয়েছিলেন দুটো সন্দেশ সহ। তখনো ছোঁয়নি। সুরবালা পাশেই ছিলেন, বললেন, কী কাঠ ওগুলো ?

—আজ্ঞে, গামাই।

—এত দামি কাঠ বানাতে গেলে কেন ? অনেকদিন টিকব ঠাকুরাইন। পুরানা কাঠের দুইটা ফালি আছিল।

সুরবালা বললেন, চা খাও। জুড়িয়ে যাচ্ছে। মুড়ি দেব ? গিরিদা ?

ষাট ছুঁই ছুঁই গিরিধারী বলল, না গো। এইমাত্র খাইয়া আইলাম। এখন আবার এইগুলো

কেন ? কর্ণফুলির দেওনপুরা গিয়া একবেলা ভাত খাইছি।

—খেয়ে নাও। তোমার কর্তাও এমন সময় তা খান।

নলিনী মজুমদার ইজিচেয়ারে তখন বসে পড়েছেন। বললেন, খুব ঝকঝকে পালিশ করেছ। এত পয়সা করাতে গেলে কেন ?

—কত নেব বলো না গিরিধারী ?

—কী যে কন আপনার ?

—কেন ? এমনি নেবে ?

—না কর্তা। এমনি কেউ কিছু দেয় ? এমনি না।

—এমনি না ?

—না।

—তো বলো কত ?

—দাম পাইয়া গেছি আইজ্ঞা অনেক আগে। আরো ঋণ আছে।

—অনেক আগে ? ঋণ ? মানে ?

—হ কর্তা। কান্ত-র জ্বরের রাইতে এক টানা বইয়া রইছিলেন তার শিয়রের ধারে। জলপট্টি দিতাছেন একটু পর পর। জাগতে জাগতে আমার চৌখ ঘুমে ঢলকায় কিন্তু, আপনার চৌখে ঘুম নাই। মা-মরা ছাওয়ালের পাশে বইসা রইলেন সারারাইত। সেই রাইতের কথা মনে আছে কর্তা ? না আপনারেই কথা। কত দিন কত রাইত মনে নাই ? কত জনের শিয়রের কাছে বইসা রইছেন। সব কি আপনার মনে আছে এখনো ?

নলিনীর মনে পড়ল। ছাতনা মাঠের পাশী কান্ত। মনে থাকবে না কেন ? কান্ত এখন তো বাগানে ট্রাকের চালক।

নলিনী বললেন, এই চেয়ারের সাথে কী সম্পর্ক কান্তর ?

—সেইদিন কিছু দিতে পারি নাই। হাত খালি আছিল, বইনার বোনার কাপড় পাই নাই দুই বচ্ছর। আপনার পাওনার দিই নাই। বিন্দু বিন্দু কইরা দিন যায়। ঠাকুরের ইচ্ছায় আইজ…

কথা কাটলেন সুরবালা, বললেন, সন্দেশটা মুখে দিয়ে কথা বলা যায়। গিরিদাকে খেতে দাও না তুমি, শুধু কথা বলছ।

নলিনী বললেন, গিরিধারীর কথা বলার ধরন বড় সুন্দর। কথা বলছি। টাকা নেবে জানি। তবু।

গিরিধারীর কণ্ঠে আফসোস, তয় টাকার কথা ক্যান কইলেন কর্তা ?

—তোমাকে কথা বলাব বলেই।

কথা বলার উৎসাহ পেয়েছে তখন গিরিধারীকে। বলল, অর্থ, স্বার্থ, মাটি, দিয়া সব ঋণ শোধ হয় না কর্তা। কান্তর শিয়রে রাইত জাইগ্যা জলপট্টির ঋণ কোন টেকায় শোধ হয় আপনি কন ঠাকুরণ ?

সুরবালা আনমনাটি শুনছিলেন। আঙুল সোনা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, ঐ যে সেই

দুপুরে পেট ব্যথা হল। মাটি কামড়ে চেঁচায়। বনবাদাড় ভেঙে তিনটে গ্রাম দূরে রোগী দেখতে যাওয়া তোমার কর্তাকে কে ধরে আনল সেদিন গিরিদা ? হারুর তখন কী কষ্ট।

গিরিধারী সন্দেশ খেতে খেতে সলজ্জ হেসে বলল, ও কিচ্ছু না। এইটা করতেই হয়। একটা প্রাণ যায় যায় আর আমি চুপ থাকি।

—ঠিক এরকমই কান্তর কপালে একজন ডাক্তারের রাত জেগে জলপট্টি দেওয়া, চিকিৎসা করাও কিচ্ছু নয়। সুখের সময় তো কেউ ডাক্তার ডাকে না। অসুখ হলেই ডাক্তার। কী বলেন ডাক্তারবাবু ?

সুরবালার অনাবিল রসিকতায় গিরিধারী হাসে। ভুলেই যায় সে তৎকালীন রায়ত আর এঁরা কর্তা।

সুরবালার দেওয়া কিছুটা টাকা জোর করে রেখে যায় গিরিধারী কুটানো আনাজের রেকাবির সামনে। আর বলে যায় অভিমান ভরে, এমনই যদি করেন, আর কুনোদিন আসুম না কইয়া দিলাম।

নলিনী স্মিত হাসেন। সুরবালা জোরে বলে—না, না, গিরিদা এসো আবার। তুমি এলে আমাদের খুব ভালো লাগে। আর এভাবেই, এক মানবিক লেনদেন জনিত বিতর্কিত ঋণ—ঋণই থেকে যায় দু-পক্ষের কাছে চিরকাল।

সেই গিরিধারী আজ আর নেই। তীর্থ দর্শনে গিয়েছিল আর ফেরেনি। তীর্থের পথে কোনো এক চটিতে নাকি দেহ রাখে। বড় সুন্দর চিত্রকল্প তৈরি করে কিচ্ছা শোনাত সেই দেশের। পারুল তো পাগল ছিল কিচ্ছা শোনায়। দেখলেই চেঁচিয়ে বলত—গিরিমামা, লাউ গড়াগড়ির বুড়ির গল্প আবার শুনব আজ। আজ রাতে যাবে না কিন্তু। সুন্দরদা (বরুণ) এসেছে। সবাই শুনব।

গিরিধারী বলত, থাকুম তো ঠিক। ঐদিকে কান্তবেটা যে একলা গো। ডরায় যদি ?

—কেন, অমু কই ? ডরাবে কেন ? তালগাছের মতো লম্বা, ওকে দেখলে অন্যরা ভয় পাবে। তুমি থাকবে আজ রাতে। ও মা, গিরিমামা আজ থাকবে। অন্তহরির মাঠ পেরিয়ে সেই যে বটগাছ, বটগাছে নয়ন ভূত, তারপর যেন কী গিরিমামা ?

গিরিধারী হেসে বলত, নয়ন ভূত নয়। ও বেটা তো রাখাল। ভূতের নাম বদন। ঠিক আছে গো, ছোট ঠাকুরাইন। সইন্ধ্যা রাইতে আইজ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হইব মন লয়। আইজ কইমুনে আখালুকি হাওরের জাইল্যা ভূতের সইত্য সইত্য উপাইখ্যান।

চেয়ারটা এখনো আছে। ফ্রেমে চুলের চেয়ে একটু স্থুল একটা লম্বা চিড়। পারুলের গিরিমামা নেই। শোনা যায়, পাহাড়ি চটির পাশে এক ঝরনার ধারে ওকে দাহ করা হয়।

জীবনের পরতে পরতে কত যে তুচ্ছ গাথা লুকিয়ে চুরিয়ে জমাট বেঁধে রয়ে যায় দিনের পর দিন, আর গুমরায় নিজের মনে।

একটু উত্তাপ পেলেই সব গলে গলে বেরোয় গল্প হয়ে। এভাবেই মানুষের গল্প মানুষই ক.. . কালি ছাড়া লিখে দেয়—নলিনীর এমনই মনে হয়।

নলিনী ডাকলেন, শুনছ ?

সুরবালা বিছানায় শুয়েছিলেন। হাতে বই। অনেকবার পড়া বইটা পড়ছিলেন—গোরা। নলিনী আবার ডাকলেন এবার বেশ জোরেই, শুনছ না কেন ? কী এমন পড়ছ ?

সুরবালা জানেন—এমন এক কারণে নলিনী ডাকছেন এখন, যে কারণে পার্থিব কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

বললেন, কী বলছ ? আবার পান খাবে ?

নলিনী বললেন, না, গো। পান টান না।

—ডাকলে কেন ?

নলিনী জোর দিয়ে বললেন, এদিকে তাকাও না। এতবার পড়া বইয়ে আবার কী খুঁজছ ?

—বলো, শুনছি তো।

—মুস্কিল তো ?

—কী হল আবার ?

—তাকালে তো বলব।

কী আর করেন সুরবালা। বালিশের পাশে বইটা সরিয়ে রাখলেন। ছেঁড়া ইংলিশ গ্রামারের তলায় পড়েছিল। এটারও মলাট গেছে। সেদিন বরুণের ঘর ঝাড়পোছ করতে বেরিয়েছে। ধুলোয় ধুলোয়। চতুর্থ সংস্করণের বই, অনেক পুরোনো। যখন বইটা নিয়ে ঝাড়ছিলেন তখন তুলি জিজ্ঞেস করেছিল, কী বই ঠাম্মা ?

—খুব ভালো বই।

—তা তো বুঝলাম কার লেখা, কী বই ?

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা, একটা উপন্যাস।

—উনি কবিতা লিখতেন তো! উপন্যাসও লিখতেন ?

—শুধু কী উপন্যাস ? আরো কত কিছু লিখতেন।

—বইটা তুমি পড়েছ ?

সুরবালা বইটার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, কয়েকবার।

—কী এমন আছে এতে ?

—তুইতো পড়াশোনায় ভালো। পড়ে দেখে নিস, বুঝতে পারবি।

চুলে শ্যাম্পু দিচ্ছে তুলি। তোয়ালে সহ বাথরুমে যেতে যেতে বলল, কাজ নেই রে বাবা। যত খটখটি বই ?

সুরবালা বললেন, খটখটি!

—কঠিন গো কঠিন। এরচেয়ে কিপলিং অনেক মজার।

বইটা হাতে নিলেই খটখটি মানে যে কঠিন তুলির নিজস্ব এই প্রতিশব্দ মনে পড়ে সুরবালার। চশমা চোখেই আছে। তাকালেন নলিনীর দিকে। বললেন, কী বলবে বলো ? তুমিও খটখটি বলবে ?

—খটখটি। এটা কী ?

—কিচ্ছু না। বলো, কী বলছিলে ?

নলিনী একটু থামলেন। একটু গোছালেন ভিতরে ভিতরে। বললেন, তোমার মনে পড়ে ?

—কী ?

—ঐ ফেরিওয়ালার ডাক শুনে কিছুই মনে পড়ে না তোমার ?

কিছু সময় শব্দহীন থেকে ছোট্ট শ্বাস নেন সুরবালা। আস্তে আস্তে চশমা খুলে বইয়ের পাশে রেখে বললেন, মনে পড়বে না কেন ? সব কি ভোলা যায় স্মিত অথচ ম্লান হাসলেন সুরবালা।

নলিনী একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক কথা কেন যে বললেন, তিনিই জানেন হয়তো। বললেন, জানো, দেশবিভাগে দাঙ্গায় যত লোকের প্রাণ গেল এর চেয়ে অনেক বেশি লোক মরে গেল অসুখে, অভাবে।

সুরবালার জানা আছে নলিনীর মুখে দেশভাগ ও এই ফেরিওয়ালা মানে প্রসঙ্গ কোথায় গড়িয়ে আবর্তিত হবে এবং একসময় শীতল বরফের মতো জমে যাবে।

বুকের বাঁদিকে খুবই হালকা এক মোচড় খেলো সুরবালার। নলিনীকে দিকচ্যুত করার জন্যে বললেন, মাথায় ঠান্ডা তেল দিয়েছিলেন চানের আগে ?

নলিনী একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, আমি কী বলছি আর, তুমি কী বলছ বলো তো ?

নৈঃশব্দ সুরবালার।

নলিনীর মেজাজ এখনো ঠিক নেই। বললেন, যদি ঘুম পায়, তো বসো না রে বাঁদি, বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোও। বলেই জানালার বাইরে তাকালেন আবার।

সুরবালা ম্লান হাসলেন। ভাবলেন, মানুষটাকে বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। বললেন, সমঝোতার স্বরে, একটু জল খাবে খটখটির দাদুভাই ?

নলিনী পাত্তা দিলেন না। কোনো জবাবও দিলেন না।

ওকে লক্ষ করে সুরবালা বললেন, দূর, অনেক দূর থেকে হালকা ভেসে আসা হাওয়ার শব্দে মনে আছে, ওর বায়না। ফেরিওয়ালার হাঁক আমিও প্রায়ই শুনি। শুনে কী হবে ? নলিনীর মান ভাঙ্গে। বললেন অবুঝের মতো, লোকটারে ডাকি তবে ? এখনো বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—কেন গো, কেন ডাকবে ?

—কিনব ?

—কী কিনবে ?

—তার শখের জিনিস। নখের পালিশ, চুলের ফিতে।

—কাকে দেবে কিনে ?

নলিনী তখন অবোধ বালক। বললেন, বাঃ রে। কাকে দোব ? কাউকে না। কিনে রেখে দেব তোরঙ্গে।

সুরবালার গলা অল্প কেঁপে যায়। বললেন—কেন ? কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকেন

নলিনী।

চশমাটা আবার তুলে কাপড়ের আঁচলে কাঁচ দুটো মুছতে মুছতে বললেন অন্য কথা, পুজো এসে গেল, তাই না ?

—হঠাৎ পুজোর কথা কেন ?

—মনে পড়ল এমনি।

—কী ?

সুরবালা আবার তাকালেন নলিনীর দিকে। বললেন, পুজোর চারদিন চারটে জামা দিতে হত ওকে। তুমি ঢাকা থেকে আনাতে। এমনি মনে পড়ল কথাটা। পুজো এলে মনে পড়ে প্রতিবার।

নলিনী বললেন, কতদিন হয়ে গেল, না ? কখনো মনে হয়, অন্য কোনো জন্মের কথা।

ভাসাভাসা স্বরে সুরবালা বললেন, হুঁ। কিছুই তো থেমে থাকে না। দিনগুলো জলের ধারার মতো বইতেই থাকে।

নলিনী বললেন, কত বয়স হত ওর ?

একটু ভেবে সুরবালা বললেন, শ্রাবণের শেষে জন্ম তো। এখন আশ্বিন। তেইশ পেরিয়ে চব্বিশ হত।

নলিনী অন্যমনস্ক, একটু হাসেন।

সুরবালা বললেন, হাঁসছ কেন ?

—ভাবছি।

—কী ?

—এতদিনে বিয়েটিয়ে হয়ে যেত রেবার মতো। ওর শ্বশুর শাশুড়ি টের পেত কী দামাল পেয়েছে ওরা। তাই না ?

—আরে না না। কী যে বলো। একটা বয়সে এলে সব মেয়েরা শান্ত ধীর স্থির হয়ে যায়। চিরকাল কি ওরকম দামাল থাকত ?

—শেষ দুপুরের আকাশে তেমন পাখি নেই। সাদা সাদা মেঘেরা আর মেঘ নয়। বনবাদাড়, বালুচরের কাশফুল হয়ে গেছে সব। এই কাশফুল ওড়ে, মিলিয়ে যায়। দূর আকাশের কোন্ ধরে কাশফুলের ফাঁকেফোকরে একটি ডাকোটা উড়ে যায়। সন্ধে মিলাতেই দমদমে নামবে। বরুণ ব্যাঙ্কের কাজে প্রায়ই যায় এই বিমানে।

বিমান মিলিয়ে গেছে উত্তরের আকাশে। ওখানে কাশবন। বাতাসে তখন প্রায় বিলীন শব্দ। উত্তরবঙ্গের আকাশ চিরে সোজা নামবে দক্ষিণে, তারপর নাক ঘবারঘর উড়েই তো কলকাতা। বিমানের এ ভূগোল নলিনীর পরিচিত। অনেক আগে দুবার গেছেন। সোজাসুজি ওড়া যায়। ওদের আকাশ দেয় না ওরা। ভিন্ন রাষ্ট্র, পূর্ব পাকিস্তান। পঁয়ষট্টির যুদ্ধের পর আকাশে বেড়া দিয়ে দিল।

এভাবে কী আকাশটাকেও জমির আলের মতো ভাগ ভাগ করে বহুখণ্ডে বিভক্ত করে

দেবে বিভিন্ন রাষ্ট্র ? তারপর হাত দেবে বাতাস আর সূর্যালোকে। এভাবে খণ্ডিত বাতাস আর রৌদ্র নিয়েই কী তুষ্ট হবে পৃথিবীর মানুষ ?

সুরবালা বললেন, কোথায় চলে গেলে খটখটির দাদু ?

খটখটির দাদু তখনো আনমনা—বিমান, আকাশ আর কাশফুলের শূন্য উদ্যানে। বললেন তেমনি স্বরে —একটু জল দাও।

—চা খাবে ?

—এখন না।

গল্প বলার ছল পেয়েছেন নলিনী, তেমনি অর্থহীন অথচ প্রবল উৎসাহে বললেন, সেদিনের কথা মনে আছে তোমার ?

বইপড়া হয়ে গেছে বুঝলেন সুরবালা। সূচিকর্মে তেমন ইচ্ছে নেই এখন, তবু নিয়েছেন। রেশমের সাদা কাপড়ে পাতলা সবুজের নক্সা তুলছেন, বললেন, কোন্ দিন ?

—যেদিন জন্ম হল ?

সূচ গেঁথে গেল সুরবালার মধ্যমার ডগায়। গাঢ় লাল পুঁতির দানার মতো এক বিন্দু রক্ত আঙুলের মাথায়। কাপড়ের পাড়ে মুছে নিলেন। নলিনীর নজরে পড়েনি। পড়লে রক্ষে নেই। সুরবালা জানেন টি এস-এর গাঁথা খেতে হবে নির্ঘাৎ।

নলিনী আবার বিরক্ত। বললেন, কী করছ এসব। রাখো আমার কোনো কথাই শুনছ না মন দিয়ে।

—শুনছি গো।

—কী বলেছি, বলো তো ?

একটু সময় নিয়ে সুরবালা অস্পষ্ট বললেন—ওর জন্ম।

নলিনীর বিরক্তির অবশেষও নেই। বললেন, মনে আছে তোমার সেদিনের কথা ?

—মনে নেই আবার ? শ্রাবণের ঢল নেমেছিল সেদিন। তুমি সদরে গেছ কাছারির কী কী কাজে। সুভদ্রা ধাই-র সেদিন কী দাপট। ও একলাই মিডফোর্ড মেডিকেল। সেসব মনে থাকবে না ? খুব মনে আছে।

ভীষণ উৎসাহিত হলেন নলিনী। দোসর পেলে যেমন পথ চলার ক্লান্তি থাকে না। গলায় অবসাদ নেই। বহু পুরাতন, শতচ্ছিন্ন, প্রায় হারিয়ে যাওয়া প্রিয় পুঁথি খুঁজে পেয়েছেন কতদিন পর, যে পুঁথির বিবর্ণ, মলিন পাতায় পাতায় কত লুপ্ত গল্প জীবন্ত হল এ মুহূর্তে, আসন্ন বিকেলের এই গুমোট কক্ষে।

হৃত-আবেগ পুনরুদ্ধারের আতিশয্যে বললেন নলিনী—হ্যাঁগো! আমি সদরে ছিলাম। কাছারির কাজ শেষ হয়েছে দুপুরের পর। অশ্বনী ছিল সঙ্গে। কোর্টের ভিড়ে ছাতা কোথায় রেখেছিলাম, হারিয়ে গিয়েছিল। কী বৃষ্টি ছিল সেদিন। সন্ধের পর বাড়ি ফিরে যেই না উঠোনে পা দিয়েছি শুনি —গলা ঝাঁজিয়ে ঠা ঠা করছে তোমার মেয়ে। কী জোর ছিল গলায়, বাপরে।

সুরবালা শান্ত স্বরে বললেন, তুমি ফিরে আসার প্রায় এক ঘন্টা আগে জন্মেছিল।

সুরবালাকেও একই পুঁথি ভর করেছে সমানভাবে। বললেন, শুধু কি গলার জোর ? কী জেদ! সব জেদের কান্না। পান থেকে চুন খসলে উপায় নেই।

—কেন জেদ করছিল ?

—কী করে বলব ? তখনো তো মুখে কথা ফেটেনি। মাত্র দু-তিন ঘন্টা বয়স। কেন জেদ, বলে বোঝাব কী করে পাকা বুড়ি ? কথাগুলো বলে একটু হাসলেন সুরবালা বা হাসলেন না। সব হাসিকে হাসি বলা যায় না। জানলায় দেখা যায়, উত্তরের আকাশে ছিন্নভিন্ন ভাসমান কাশফুল নেই। বদলে কালো কালো মেঘ দখল নিয়েছে কাশফুলগুলোকে উড়িয়ে, তাড়িয়ে।

এক পশলা এমন বৃষ্টি হবে এখন, নৌকোর এক গলুই ভিজলে অন্য গলুই ভিজবেই না। এর নাম শরতের খামখেয়ালি বর্ষণ।

হলও তাই। নলিনী দেখছেন—জবাগাছ পুরো ভেজেনি। উঠোনের একদিক খটখটে। বাইরে মেলে দেওয়া দুটো কাপড় ছাড়া বাকি সব জলো বাতাস পেয়েছে শুধু। এ যেন হরি সংকীর্তনের বিশৃঙ্খল হরির লুঠ। মেঘেরা আকাশ থেকে লুঠ দিচ্ছে, বাতাসা-নকুলদানা কেউ পায়, কেউ পায় না। কোনো শব্দ নেই ঘরে।

এক সময় সুরবালা বললেন, কালীবাড়িতে বালাটালা বিলিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেই পিসিমা নাম দিলেন পারুল। বাবা দিতে চেয়েছিলেন শ্রাবণী। পিসিমার জেদের কাছে বাবা হার মানলেন। তুমিও নাম রেখেছিলে।

নলিনী তখনও দেখছেন—সংকীর্তনী কালো কালো মেঘেরাও উধাও। এখন আকাশ ফাঁকা। একটা গাঢ় সবুজ ঘুড়ি নীল আকাশে। ঘুড়ি কাৎ হয়ে উপুড় হল। তারপর দে গোত্তা, গাছের মাথা প্রায় ছোঁয় ছোঁয়। নিপুণভাবে পলকে দিক পাল্টে আবার উঠে গেল অস্থির ঘুড়ি শান্ত আকাশে। কোনো দামালের হাতে লাটাই পড়েছে হয়তো। ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের গভীরতা মেপে নিতে চায়। এরকমই ভাবতে ভাবতে নলিনী বললেন, সে অনেক পরে। তখন কথা বলতে শিখেছে। নামটা তোমার মনে আছে ? অনেকদিন সরবে উচ্চারিত হয় না এ নাম ?

সুরবালা বললেন, বাঃ! মনে থাকবে না কেন ? আমি ডাকি এখনও মনে মনে। নলিনী তাকালেন সুরবালার দিকে।

সুরবালার হাতে এখন সূচিকর্ম নেই।

নলিনী বললেন —আমিও বলি গো।

—আমি জানি।

—তুমি জানো!

—হুঁ।

—একবার বলো না নামটা।

যেন অপেক্ষায় ছিলেন সুরবালা। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, গলা কাঁপল, ফুলটুসি, ফুলটুসি। সিলিঙে মৃদু ঘুরছে পাখা। ঘরে হাল্কা বাতাস। শরৎ এলেও গরমের ভাপ রয়ে গেছে। ঘুড়িটা

এখন খুব উঁচু আকাশে কেঁপে কেঁপে উড়ছে আর লক্ষ করছে ভূমণ্ডলকে—নলিনীর তাই মনে হয়।

সুরবালার 'ফুলটুসি' ডাক শুনতে পেল কী— নলিনী ভাবলেন শুনলে বড় ভালো হয়। কেন হয়—জানেন না।

হঠাৎ প্রায় নির্বাক হয়ে যাওয়া নলিনীকে সুরবালা বললেন শান্ত স্বরে, সাড়ে চারটে বাজে। কিছু খাবে ?

জোরে কথা না বলে নলিনী মাথা নাড়লেন—খাবো না।

সুরবালা আবার বললেন, একেবারে চুপ হয়ে গেলে যে ?

—একেবারে চুপ হয়ে গেলে বাঁচি। কিন্তু তোমায় ফেলে...

নলিনীর কথা কাটলেন সুরবালা। ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না ?

—তুমি যখন বলো তখন আমার কী হয় এবার বুঝেছ ?

যেন জাদু করতে পেরেছেন সুরবালাকে তেমনি বালকসুলভ তৃপ্তির আভাস ফোটে নলিনীর চোখেমুখে।

—সবই তো তার। যত কিছু বাকি আছে, তাও পূর্ণ করে দাও তুমি। বাঁচিয়ো আমি।

সুরবালার পরিশীলিত, অর্জিত জমে জমে স্তরীভূত শিলার মতো একনিষ্ঠ আবেগ নীরবতাকে স্পর্শ করে নলিনীকে। বললেন, ক্ষমা করো ফুলটুসির মা। বুঝে বলেই বললেন, এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি।

ঘুড়ি কেঁপে কেঁপে আগের মতোই স্থির হয়ে আছে। আকাশের নলিনীরা বোধ হয় জেনে ফেলেছে, কোথাও জেনে নিয়েছে কাকে উপলব্ধি দুটি মানব-মানবীর বোঝা ও অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা। এখন, উত্তরের আকাশ ছেড়ে সরে যাচ্ছে দূরে, অন্য আকাশে। কিংবা লাটাইধারী হয়তো সরে গেল নামহীন আলো এক শীতল আকাশের খোঁজে।

সুরবালা বললেন, কী হল ডাক্তারবাবু ? কিছু বলো।

এবার নিরুপায় নলিনী। বললেন, কী বলব ?

—কেন গো ? হঠাৎ কী হল তোমার ?

নলিনী বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। নিজেকে জলের ধারার মতো বইতেই থাকে। এত সহজে করে গভীর কথাগুলো যে কী করে বলো তুমি।

সুরবালা পরিপূর্ণ হাসলেন, তবে শব্দহীন নলিনীর প্রতি অদ্ভুত মায়ায় ভরে গেল মন। বললেন, তুমিও তো।

—কী আমিও তো ?

—ভেতরে ভেতরে অনর্গল কথা বলো, আমি টের পাই।

গলির পথে সাইকেল চলে গেল বেল বাজিয়ে। বেশ দূরের বড় রাস্তা থেকে গাড়ির শব্দ ভেসে আসে ক্ষীণ। উঠোনের কোণে পোঁতা খুঁটি ছুঁয়ে রাধাচূড়া গাছের ডাল উপরের ডালে কিশোরী শালিকজোড়া পাখির বিরতিহীন ঝগড়াঝাঁটি।

নলিনী বললেন, আসছে আবার। ডাকি ?

—কাকে ?

—ফেরিওয়ালাকে ?

—কেন ?

—কিনব।

—কী কিনবে ?

—আলতা, লেবেনচুষ।

—কী যে বলো তুমি ?

—কেন ?

সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে সুরবালা দেখলেন নলিনীকে। বললেন, তুমি শোও। চা করে আনি। খাবার দিই কিছু। সেই এগারোটায় একমুঠ ভাত খেয়েছ।

নলিনী নাছোড়। বললেন, না খাব না এখন। তুমি বসো। বলো না, কিনব ?

—কেন কিনবে ? কার জন্যে কিনবে ? কী হবে এসবে ?

নলিনী শান্ত হয়ে যান। চুপচাপ বসে থাকেন। নিজের কর্কশ ব্যবহারে অনুশোচনা হয় সুরবালার। বললেন নরম স্বরে, রাগ করলে ? আমার এমন বলা ঠিক হয়নি গো।

নলিনী আবার পুরোপুরি নলিনী। তাকালেন বাইরে। আকাশে আলো ঝিমিয়ে গেছে। দু-একটা তারার মুখ দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে বললেন, না না, ঠিক আছে। তুমি ঠিকই বলেছ।

—কী হবে এসবে ?

তখন গলির অন্য প্রান্তে ফেরিওয়ালার হাঁক দূরে, বেশ দূরে মিলিয়ে যায়।

নলিনী-সুরবালা বসে থাকেন শব্দহীন। বাইরে, ডানায় ভর করে শ্রান্ত পাখিরা সন্ধ্যা বয়ে এনে ছড়িয়ে দেয় গাছের মাথায়, ঘরের ছাদে, খোলা উঠোনে, আর এক গবাক্ষ সম্বলিত এই ঘুপচি প্রায়ান্ধকার ঘরে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন সুরবালা। সুইচ টেপেন। ঘরের একমাত্র আলো জ্বলে ওঠে। রান্নাঘরে হিটার জ্বালিয়েছে সাধনা। সুতরাং আলো জ্বলে দুর্বল মোমের মতো।

বিরক্ত নলিনী বলেন, আলো নেভাও।

—সন্ধে হল যে।

—হোক সন্ধে।

—অন্ধকার হল, দেখছ না ?

—হোক। এ আলোর চেয়ে আঁধার অনেক ভালো।

কথাগুলো নলিনী সুরবালাকে, নিজেকে, কাউকে বলেননি। কিংবা সবাইকে, যারা যারা আছে গোটা সময় ও বিশাল সংসারে ভিড় করে, তাদেরকে আক্ষেপ করেই বললেন হয়তো।

সুরবালা তবু আলো নেভালেন না। বললেন, জল দিচ্ছি। বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে এসে বসো। চা নিয়ে আসছি।চিড়ের পোলাও করে দেব ? সঠিক আলোর তাগিদে উত্ত্যক্ত নলিনী বললেন, না তুমি খাও।

তেরো

সবাই ফিরেছে একটু আগে। দুপুর গড়িয়েছে। তবে বিকেল হয়নি এখনো। পাশের বাড়িটার নাম 'আশীর্বাদ'। ওই বাড়িতে দিন নেই রাত নেই রেডিও। রেডিওয় টুথ পেস্টের বিজ্ঞাপন সহ সিলোন, কোনোসময় বিবিধ ভারতী। ওই রেডিও শুনে শুনেই নলিনী জেনেছেন—'ইয়ে সিলোন ব্রডকাস্টিংক বিদেশ বিভাগ হৈ'— বিদেশে ভারতীয় সিনেমার গান খুব বাজে। গান বাজিয়ে বাজিয়ে যে দাঁতের মাজন বিক্রি করে। যেমন গান গেয়ে ও দেশে ফেরি করত ভজহরি নানান আচার, লেবেনচুষ।

রেডিও বন্ধ হলে গ্রামোফোন। গ্রামোফোন তো নেই আর। লক্ষণের কাছে শুনেছেন একদিন, ওটা নাকি 'রেকট পেলার'। নলিনী শুধরে দিয়েছেন—না রে, রেকর্ড প্লেয়ার। লক্ষণ তবু একইরকম বলে। বুম্বার বয়েসী, কাজের লোক।

আজ ওই বাড়িতে দুটোই বন্ধ ছিল কিছু সময়। এখন আবার সরব রেডিও। এখন গানটান নয়। খবর আসছে বাংলায়, বলিষ্ঠ কণ্ঠের ঘোষিকা। খবরে প্রকাশ, ভোর রাতে এগারোজন সমাজ বিরোধী পুলিশ ভ্যান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় চাঁচল-হরিশচন্দ্রপুর রোডে কর্তব্যরত সি আর পি গুলি বর্ষণ করতে বাধ্য হয়। পরে সবকটা লাশ নিকটবর্তী জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মৃত সমাজবিরোধীদের বয়স আনুমানিক আঠারো থেকে তেইশের মধ্যে। এরই প্রতিবাদে ওই অঞ্চলে এক রাজনৈতিক দল (বেআইনী বলে ঘোষিত) চব্বিশ ঘন্টার 'বন্ধ' ডেকেছে।

খবরটা নলিনীর কাছে পৌঁছুতেই কয়েক পলকের জন্যে এই চিন্তা মগজে এল—অন্ধকার ভোর ভোর সময়ে কম বয়েসী সমাজ বিরোধীদের নিয়ে পুলিশ কোথায় যাচ্ছিল ? প্রাতঃ ভ্রমণে ? তারপর চিন্তাটা আবার মিলিয়ে গেল এখন সঙ্গত কারণে।

তবু ভাবছেন হাল্কা স্বপ্নে বিভোর ছেলেমেয়েদের কেন সবাই সমাজবিরোধী বলে ? অনেক গ্লানি, অনেক পরাজয় ঝেড়ে ফেলে কিছু সতেজ ছেলেমেয়ে স্বপ্ন তো দেখে—যতই অসম্ভব ও অবাস্তব হোক। সব সমান। সবাই সমান। এমন স্বপ্নে দোষ কোথায় ? তবে এটাও ঠিক, পাইপগানের ব্যারেল থেকে স্বপ্ন নয়, মানুষের হাহাকার বেরোয়। কিন্তু ওরাই কী একলা ওসব চালায়। ওদের আড়ালে অন্যরা চালাচ্ছে নাতো—কিছু ছদ্মবেশী ? এমন এক স্বপ্ন দেখুক না, যে স্বপ্ন অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

আজ আর বেশি ভাবতে পারছেন না। ভালো লাগছে না। খেই হারাচ্ছেন। অন্য দিনও ভাবেন। খুব তলিয়ে সব বিষয়কে চিরে চিরে ভাবেন। কিছুদিন আগে যখন শুনেছিলেন—কে বা কারা, অশীতিপর বৃদ্ধ হেমেন বসুকে খোলা রাস্তায় কাকভোরে কুপিয়ে মেরে ফেলল। সেদিন সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা-রাতে জলবিন্দুও স্পর্শ করেননি নলিনী। বারবার বিদ্ধিত করেছে একই চিন্তা—রক্ত ঝরিয়ে মানুষ কোন সমীকরণের সমাধান খুঁজে পায় ? পৃথিবী জুড়ে রক্তের এত অপচয় কেন ? এখনো চলছে ভিয়েতনাম, কোরিয়া, চিলি, লাতিন আমেরিকা, উগাণ্ডা, জেরুজালেম—কোথায় নেই ?

মিডফোর্ড মেডিকেলের কথা মনে পড়ে। তখন ক্লাসে ইউরোপীয়ান স্যার পড়াতেন, এক বিন্দু রক্তের সৃষ্টি মানে কত পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাণ। কী জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া, কত অমূল্য সময় ব্যয়িত হয়ে এক ফোঁটা রক্ত। অথচ অস্ত্রের এক কোপে এই মহার্ঘ তরল জলের স্রোতের মতো গড়ায় যত্রতত্র, নালায়-খালায়। রক্তের প্রকৃত মূল্য মানুষ কি কোনদিন বুঝবে না ?

অবশ্য আজ এত সব ভাবছেন না অন্যদিনের মতো। এখন রেডিও বন্ধ। পরিবর্তে গান ভাসে প্লেয়ারে—'টুটে অগর সাগর নয়া/সাগর কোই মিলে/মেরে খুদা দিলসে কোই কিসিসে না খেলে।'

নলিনী প্রায়ই শোনে, এই গান গলা ফাটিয়ে বুম্বা সবসময় গায় মাতাল মাতাল স্বরে।

একফোঁটা ভাষা বোঝেন না। সুতরাং জানেন না কী গায় রেডিওর গায়ক ও বুম্বা। নলিনীর শুধু মাথা ধরে আর অনুভব করেন—সাপের পুরনো ছাল খসে পড়ার মতো মূল্যবোধ ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। আরো পড়বে। তখনো প্লেয়ার বাজে একটানা।

চোদ্দো

ধোয়ামোছা স্নানটান করেছে সবাই। নলিনীও করেছেন। কেউ গরম জল দেয়নি। কয়েক বছর থেকে প্রতিদিন উমলি গরম জলে স্নান সারেন বেলা বারোটার আগে। অন্যদিন সুরবালা করিয়ে দেন। উঠোনের বাঁদিকে তুলসীতলায় দুটো বরুয়া বাঁশের খুঁটি গেড়ে আরো এক ফালি বাঁশ আড়াআড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ছোট্ট একটা মাটির ঘটি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বাঁশে। ঘটিতে জল। তলায় ছিদ্র করে নতুন কাপড়ের টুকরো পাকিয়ে সলতের মতো ভরে দেওয়া হয়েছে ছিদ্রে। সলতে বেয়ে জল পড়ছে বিন্দু বিন্দু। যেখানে জল পড়ছে মাটিতে, মাটির তলায় ছোট এক পেতলের ঘটিতে রাখা হয়েছে অস্থি। উষ্ণ অস্থি সিঞ্চিত, শীতল করা হবে—এটাই হয়তো অভিপ্রায়। গোটা জীবন মানে তো অনেকগুলো বছর ধরে, অনেক লেলিহান উত্তাপের ভাপ খেতে খেতে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। তাই আধপোড়া অস্থিতে কী জলের ফোঁটা ? নাকি নিছক দেশাচার ? নলিনীর কাছে অর্থহীন লাগে এসব, এই মুহূর্তে।

বরুণ ও হারুর পরনে মার্কিন কাপড়ের দুই ফালি। দুজনের গলায় ধড়া। ধড়ায় লটকানো লোহার চাবি। ওরা দুজন এখন যে যার ঘরে দরজা বন্ধ।

কাকবলি দেওয়া হয়েছে। কাক নেয়নি। অদূরে গাছের ডালে বসেছিল একটা। দেখেও না দেখার ভান করে উড়ে গেছে। কাকের এমন আচরণে একটু অবাক লাগে নলিনীর। অথচ বিস্কুটের এক কণা ফেললে যত রাজ্যের কাক কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয়। আর এখন। নাকি ওরা বোঝে নেয়—ওই বাড়িতে, আজ কেউ চল্লে গেল। খাওয়া দাওয়া, দৈনন্দিনের সব বিলাসিতা অন্তত আজ স্থগিত থাকুক। কাকেদেরও নিজস্ব এক আন্তরিক দেশাচার আছে কি ?

নলিনী অলস চোখে লক্ষ করছেন সব। কলাগাছের বাকলের খোলে পড়ে রয়েছে ভেজা সাবুদানা, কলা, দুধ। কেউ ছোঁয় না।

নলিনীর আশ্চর্য লাগে—কাকেরাও কোনো কোনো দিন কাঙাল থাকে না। ওদেরও সংযম

বলে বিশেষ এক মানবিক গুণ নিশ্চিতই আছে। বরুণ কয়েকবার ডেকেছিল আয়, আয়। কেউ পাত্তা দেয়নি ওর ডাকে। বরঞ্চ দুটো কাক একটু পরই উড়ে গেল দূরে, বলে গেল—আজ খেতে নেই। খেতে নেই। খেতে নেই। মন নেই, মন নেই, মন নেই। নলিনীর তাই মনে হয়েছে।

হারুর ঘর থেকে অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সিগারেটের গন্ধ ছড়াচ্ছে উঠোনের খোলা হাওয়ায়। ওই কোণায় কাত করে রাখা সুরবালার তক্তাপোষ।

বড় বউমা সরলা একবার উঁকি দিল এ-ঘরে। তারপর জিজ্ঞেস করল, বাবা, কিছু দেব ?

নলিনী দেখলেন একবার সরলাকে। এ মেয়েটাই তো কয়েকদিন আগে সুরবালাকে বলেছিল কর্কশস্বরে —বাবার সবকিছু আপনিই করে দেবেন। আমাদের হাতের কোন কিছুই যখন ওর মনমতো হয় না। ঝামেলা যত।

এ মেয়েটাই আজ সকালে নিষ্প্রাণ। সুরবালার গলা থেকে হারের ছড়া খুলে নিচ্ছিল তারপর হাত থেকে চারগাছা সোনার চুড়ি। কাঁদছিল। এ কেমন কান্না। বিষয় বোঝে আবার হাপুস নয়নে কাঁদে। কোনটা সত্য ? আভূষণ খুলে নেওয়া, না হু হু করে গাল ভেজানো—নলিনী নিরূপণ করতে পারেন না এখন।

সরলা আবার ডাকে, বাবা!

হঠাৎ বিরক্ত নলিনী বললেন, কী ?

—কিছু দেব আপনাকে ?

—কী দেবে ?

—কিছু খাবেন ?

—কী ?

—কিছু খান। ফল টল ?

সরলা জানে—ফল-দুধ খেলে নলিনীর অম্ল হয়, তবু বলার জন্যে বলা।

কিছু বলছেন না দেখে আবার ডাকল, বাবা।

—বলো, কী বলবে ?

—আপনার ছেলেরা আজ কিছু খাবে না। বাকিরা দুধ টুধ খেয়ে নেবে। আপনাকে দিই কিছু ? সাবু কলা ?

নলিনী দেখেছেন—হারুর ঘরের দরজার ফাঁকে তখনো সিগারেটের ধোঁয়া। একটু আগে এই সরলাই ট্রেতে ভরে খাবার নিয়ে গেছে বরুণের ঘরে। ওরা কী করে খেল আজ ? সরলাকে বললেন, নাঃ কিচ্ছু না। এক গ্লাস ঠান্ডা জল দিও শুধু। এখন যাও।

সারা মুখে এক ছোপ হাল্কা অবজ্ঞা মেখে সরলা চলে গেল অন্যঘরে।

এখানে বসেই নলিনী শুনলেন—সরলা একইরকম স্বরে জোরে জোরে কাজের ছেলেটাকে বলছে, এই লক্ষ্মণ, নিচের কোণার ঘরে এক গ্লাস জল দিয়ে আয় তো।

আত্মীয় স্বজনেরা, পাড়া পড়শিরা যে যার দুঃখ দুঃখ দেখিয়ে ফিরে গেছে। বড় নাতি উপরতলায় ওদের ঘরে বেশ জোরে গান করছে, ফিল্মের।

একা বসে আছেন নলিনী। অবাক লাগে। কেউ উদ্বেল নয় কেন ? একটা মানুষ এতদিন এই পরিবারে থেকে গেল। থেকে গেল কি! যাঁর রক্ত শ্বাস মজ্জায় এ পরিবারের সৃষ্টি, আলো বাতাসের মতো মিলেমিশে ছিল এতদিন একটা মানুষ! সেই মানুষটা চলে গেল আজ, অথচ কারো তেমন কোনো বিকার নেই। একটু ভার ভার মনোভাব নেই কেন ? একবার খিলখিলিয়ে হাসির শব্দ শোনা গেল হারুর বউ সাধনার। আজ হাসির কী ঘটে গেল এমন—নলিনীর কাছে স্পষ্ট হল না।

সকাল ছয়টার একটু পর সুরবালার চলে যাওয়া ছাড়া এমনকি উল্লেখযোগ্য ঘটে গেল এ বাড়িতে আজ নলিনী ভেবে পেলেন না।

নলিনী এও টের পাচ্ছেন সুরবালার হাতের শেষ কয়েকগাছা চুড়ি ও একমাত্র হার ভাগাভাগি করে নিচ্ছে সরলা-সাধনা, বরুণ ও হারুর সামনেই। একটু মন কষাকষি হবে হয়তো দুই বউয়ে। কারণ, সরলা সাধনার সোনাদানায় বড় বেশি লোভ—এ তুচ্ছ খবরও নলিনীর অজানা নেই। অথচ কাউকে এসব বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি সুরবালা কোনোদিন।

ঝুমুর ঝুমুর শব্দে ওপরতলা থেকে নিচে নেমে আসছে তুলি। প্রায় ছুটতে ছুটতে গেট পেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ডাকলেন নলিনী, কোথায় যাচ্ছিস রে ? শুনে যা একটু।

মুখ না ঘুরিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততায় জবাব দিল তুলি, ইনস্টিটিউট, আবার কোথায়।

—ওখানে কী ?

সামনের উইকে নাচের এক্সাম্। লেট হলে নয়না ম্যাডাম ক্যাচ ক্যাচ করবে। বলেই তুলি বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো।

ওর হাতের ফোমের ব্যাগে বয়ে নিয়ে যাওয়া ঘুঙুরের শব্দ তখনো কানে বাজছে নলিনীর। ভাবলেন—আজ নাচ!

পনেরো

লক্ষ্মণ এক গ্লাস জল রেখে গেছে টেবিলে। ছুঁলেন না নলিনী। স্পৃহা নেই। প্রবৃত্তি হল না। পিপাসা মরে গেছে দুপুরের পর।

ওপরতলায় কেউ রেডিওর টিউনিং নব্ একাধারে মোচড়াচ্ছে। অনেকগুলো বেতার তরঙ্গে একইসাথে এলোপাথাড়ি স্পর্শ করায় শব্দ হচ্ছে—কুলুব্-কুলুব্-কুলুব্। বড় নাতি বুম্বা হবে—নলিনী অনুমান করলেন।

টিউনিং রেঞ্জে জুতসই কিচ্ছু না পেয়ে বুম্বা নিজেই গান ধরল বেশ দরাজ গলায়—রাত নশিলী / মস্ত শমা হৈ / আজ নশেঁ মে / সারা জাঁহা হৈঁ—

নলিনী ভাবলেন, কোনো সিনেমার গান হবে। লুকিয়ে চুরিয়ে ভীষণ সিনেমা দেখে ছেলেটা। শরীরে, কাপড়ে চোপড়ে সিগারেটের গন্ধ পান প্রায়ই। নলিনীর অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চোখ স্পষ্ট বুঝে নেয় ছেলের আরো কুঅভ্যাস আছে দৈহিক। দুই চোখের কোল দেখলেই বোঝা যায়। নলিনী ঠিক বুঝতে পারেন—নাতি বেপথু হচ্ছে দিনদিন।

[illegible]

এত কম সময়ে একজন মানুষ চলে যেতে পারে ? হয়তো যায়। এভাবেই তো মানুষ যায়! এইসব ভাবতে ভাবতে নলিনী তাকালেন আবার বাইরে, যেখানে সুরবালার ব্যবহৃত কাপড় তক্তপোষ পড়ে আছে অবহেলায়।

উঠোনের লেপন ফেলে কাদা-মাখা হাতে ঘরে ছুটে এসেছিলেন সুরবালা। শুয়ে পড়েছিলেন তক্তপোষে।

নলিনী তখন পঞ্জিকায় কিছু পড়ছিলেন। সুরবালা ওকে বলছিলেন, শুনছ, শরীরটা কেমন করছে।

উদ্‌গ্রীব নলিনী বলেছিলেন, কী হয়েছে বলো তো ?

সুরবালা কোনোমতে বলছিলেন, বুকে চাপ চাপ লাগছে। শ্বাস নিতে পারছি না গো।

তটস্থ নলিনী এলেন সুরবালার কাছে। বলছিলেন, কখন থেকে এমন লাগছে ?

—এই হঠাৎ।

—রাখো দেখি।

বলে নাড়ি দেখছিলেন নলিনী।

তলিয়ে যাওয়া গলায় বলছিলেন সুরবালা, বুক ফেটে যাবে মনে হচ্ছে। একটু তুলে ধরো তো আমায়।

বিহ্বল নলিনী ওর পিঠে হাতের ভর দিয়ে শরীরটা একটু তুললেন।

বড়ই অস্পষ্ট স্বরে সুরবালা বললেন, ন্যায় অন্যায় সব ভুলে যেও। তোমায় প্রণামও করতে পারলাম না।

—কী বলছ ?

—বোধহয় চললাম গো। তুমি একা রয়ে গেলে।

আর কিছুই বললেন না। শুধু চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল, একবার তাকালেন নলিনীর দিকে।

নলিনী বুঝলেন—কী হয়েছে।

আরো কিছু বলতে চাইলেন সুরবালা। কী বললেন শোনা গেল না। হাত নাড়ালেন একবার। তারপর মাথাটা এলিয়ে দিলেন বাঁদিকে।

ছাপ্পান্ন বছরের উত্থান পতনময় জীবন অতিবাহিত করে সাত সকালে সুরবালা অমনি ফুরিয়ে গেলেন আড়ম্বরহীন।

নলিনী ডাকলেন পর পর কয়েকবার —ওগো, কী হল ? চলে গেলে ? ওগো!

তারপর ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে জোরে ডাকলেন, তোমরা ওঠোরে। ওঠো তাড়াতাড়ি। তোমাদের মা, আর কিছুই বললেন না নলিনী।

বাড়ির সবাই তখনো ওঠেনি। ছুটির দিন। রবিবার। আরো বেলায় উঠবে। প্রাতঃরাশ সেরে সবাই ইংরেজি ছবি দেখতে যাবে। মর্নিং শো।

ডাকাডাকিতে সবাই যখন এল এ ঘরে, তখন সুরবালার নিথর মুখের উপর রোদের হাল্কা

ঝিলিক। জানালার বাইরের জবা গাছের কয়েকটা পাতার ছায়া কাঁপছে গলা ও বুকে। বুকে কোনো ওঠানামা নেই। দুটো চোখ তখনো অল্প খোলা। মুখ হাঁ। শেষ শ্বাস নিতে চেয়েছিলেন হয়তো।

হাতে লেগে আছে উঠোন লেপার কাদা। হাতটা এলিয়ে আছে তক্তপোষের বাইরে। নলিনী দেখলেন উঠোন নিকানোর পাট সাঙ্গ হল এতদিনে।

বিকেল ফুরিয়ে গেছে। গাছের মাথায় আলো বিলীন। পাখিরা যে যার ঘরের দিকে উড়ে গেছে।

নলিনী নিজের ঘরে একা। সময় অনেক গড়িয়েছে সেই ভোর থেকে।

সময় গড়ানো তো কথার কথা। আসলে সময় সময়কে কাটে, কিংবা, আগত অদেখা সময়ও গিলে খায় পেছনের ফেলে আসা সময়কে। এসবের পরিশিষ্টকেই কাল বা মহাকাল বলে। পাতলা মেঘের মতো নলিনীর মাথায় এমন ভাবনাই ওড়ে অলস।

সুরবালাও তো মিলিয়ে গেলেন সময়ের গহ্বরে, যেমন অনেক আগেই মিলিয়ে গিয়েছিল, বা দৌড়ে ছুটে গিয়েছিল অন্য এক সময়ের পরিসরে পারুল। কিংবা দুজনেই কী নির্মম অতীত হয়েও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হয়ে থেকে যাবে—যতদিন নিজে না উঠছি বরুণ হারুর সজ্জিত, কাঙ্ক্ষিত শেষ শয্যায় ?

নলিনীর মগজে একই মেঘ বর্ষণহীন, আবার খরাহীন—উড়ে যায়। আকাশকে আচ্ছাদিত করে রাখে না কোনো মেঘ ও জলকণা। শুধু ধুলো ওড়ে।

ফুরিয়ে যাওয়া বিকেলেরও এক না ফুরানো রেশ থাকে। তেমনি, পারুল ও সুরবালাহীন স্থিতিতে ওই দুজনের সাথেই বসে রইলেন নলিনী এখন। সব রয়ে গেছে। দূর অতীত তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রেশ বিস্তারিত করে বহু দূর। এটাই সত্য।

নলিনী তাকালেন পুরোনো আল্‌নার দিকে। ওখানে সুরবালার দৈনন্দিনের কয়েকটা আটপৌরে কাপড় ঝোলানো। কিছু সময় চিন্তা করে এগিয়ে গেলেন আল্‌নার দিকে। কাপড়গুলোকে স্পর্শ করলেন একবার —অতীত আবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হয়ে গেল। সব কাপড় তুলে আনলেন নিজের বিছানায়। তারপর ঘরের অন্যকোণা থেকে টেনে আনলেন সেই পুরাতন কালো তোরঙ্গ, বিছানার পাশে। ওতে তালা নেই। কোনদিন ছিল না। খুললেন তোরঙ্গের ঢাকনা। খুলতেই এক ঝাঁক স্মৃতির ঘ্রাণ স্পর্শ করল নলিনীকে।

বড় তোরঙ্গের এক কোণায় কয়েকটা জামা ইজের এখনো ভাঁজ করা। কত বছর থেকে এমনি পড়ে আছে। মাঝে মাঝে তোরঙ্গ খুলে সুরবালা ভাঁজ খুলতেন। গন্ধ শুঁকতেন। আবার রেখে দিতেন।

কত বছর হল ? কুড়ি বছর তো হবেই। সুরবালা নিজের হাতে সেই কবে তুলে রেখেছিলেন—সঠিক মনে পড়ে না নলিনীর। ওগুলো পারুলের—ফুলটুসির।

তাকাতে তাকাতে দুই চোখে কয়েক ফোঁটা জল এল নলিনীর। খোলা তোরঙ্গের সামনে

বসে অনেকক্ষণ একাএকা অশ্রুমোচন করলেন।

নতুন এক শোক পুরাতন শোককে আজ আবার টেনে আনল ফুরিয়ে যাওয়া আলোহীন এই নিরালা ঘরে। কিংবা, দুটো শোক একসাথে আচ্ছন্ন করল নলিনীকে একলা পেয়ে। নলিনী একইভাবে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

লক্ষ্মণ আলোর সুইচ্ টিপে দিয়ে চলে গেল। কম ওয়াটের ডুম্ তেমন আলো দিতে পারল না। লক্ষ্মণ দেখেও দেখল না।

একসময় ধূতির খুঁটে চোখ মুছে তাকালেন বিছানায় ছড়িয়ে রাখা সুরবালার কাপড়ের দিকে। সব আবার তুলে নামালেন মেঝেয়। একটু সময় কী যেন ভেবে, অপটু হাতে ভাঁজ করে, একটা একটা কাপড় পর পর ভরে রাখতে শুরু করলেন তোরঙ্গে। ভাবলেন—দু-একটা ন্যাপথলিন যদি পাওয়া যেত। কিংবা ভাজা কালোজিরে। মনে আছে মা দিতেন পাট করে তুলে রাখা কাপড় চোপড়ে। কোথায় খুঁজবেন এখন এইসব। কে খুঁজে এনে দেবে ?

চোখে জল, অথচ মুখে এক অদ্ভুত হাসি। যে হাসি চোখের জলের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি, মন-কেমন-করা। কাপড়গুলো তোরঙ্গে ভরতে ভরতে একমনে বললেন নলিনী, থাকো তোমরা। মা আর মেয়ে একসাথে সুখে থাকো। এখানে আমি একা একা বেশ আছি।

ষোলো

বসুমতীর পেছন পেছেন এক বালক থাকে সবসময়। বয়স সাত ছুঁয়েছে গত আশ্বিনে—এ তথ্য তেমন জানে না কেউ। অনেকের খেয়ালও পড়ে না। কে কখন, কী করে জন্মে গেল। দেশের জনসংখ্যা সত্তর কোটি ছুঁই ছুঁই—সকলের কী আর বিষয়বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এক বছর পর যখন মাথা গোনা হবে দেশজুড়ে, তখন বালকের মাথাটাও গুনে নেওয়া হবে হয়তো। বসুমতী ওকে দূর দূর করে।

ভীষণ দুরন্ত আর একরোখা বালক। গায়ে খাকি রঙের শার্ট ঢলঢলে। পুরনো শার্ট কেউ দিয়েছে, না হলে পাবে কোথায় ? তলায় কিচ্ছু নেই। অবশ্য কোনো কিছুই দৃশ্যমান হয় না। সব ঢেকে দেয় ঢলা শার্ট। বুক পকেট নেমেছে তলায়। ওতে চানাচুর ডালমুট থাকে। অনেকে দেয়। অনেকে দেয় না। তাড়ায়। গাল দেয় শুয়োরের বাচ্চা বলে।

'বরাহের বাচ্চা' দূরে দূরে থাকে মানুষের বাচ্চা থেকে। ওদের মাথার তো ঠিক নেই—কখন কামড়ে আঁচড়ে দেবে। বয়স্ক 'মানুষের বাচ্চারা' কী জবর লাথি মারে, যেন ফুটবল। একদিন ক্ষুধায় মিষ্টির দোকানের সামনে থাক করে রাখা জিলিপিতে ছোঁ মেরেছিল ও। মালিক ওকে ধরে পাছায় লাথি মেরেছিল জোরে। 'মানুষের' লাথি খেয়ে ক্ষুৎ-কাতর সাত বছরের 'বরাহ শাবক' ছিটকে পড়েছিল কিছুটা দূরে। আর যায় কোথায়। কোত্থেকে ছুটে এসে বসুমতী দমাদম ঢিল মারে। শো-কেসের কাঁচ খান-খান। তারপর বালকের হাত ধরে দে দৌড়। অজস্র মানুষ, গাড়ি, কোলাহল, বড় শহরের ভিড়ে কত বড় বড়রা হারিয়ে যায়। এত নিতান্ত আর বিকল এক

স্ত্রীলোক।

তবু, দূর দূর করে বসুমতী। আর যতই করে, বালক পিছু নেয়। কখনো এদিক ওদিক দৌড়ে আবার ছুটে আসে, বসুমতীর আঁচল ধরে। কখনো মার খায় বসুমতীর হাতে। তবু নির্বাক থাকে। না থেকেও উপায় নেই। মানুষের সমাজে থেকেও এই বালক কোনো ভাষা শেখেনি এখনো।

এখানে নাম পাল্টে গেছে বসুমতীর। সবাই বলে 'ঢিলানী'। যখন তখন ঢিল মারে তাই। আগের কাপড় কখন ছিঁড়েটিড়ে গেছে। পরনের এ কাপড় কে কবে দিল মনে নেই। কত কিছুই তো মনে নেই।

নিবাস বলে স্থায়ী কোনো স্থান নেই। আগে ছিল হিন্দি স্কুলের বারান্দায়। ওখান থেকে পুলিশ দিয়ে তাড়িয়েছে কমিটির বিজ্ঞজনেরা। আহ্লাদী বাচ্চারা দেখলে নাকি ভয় পাবে। অথচ একটাও শিশু বালক বালিকা ওকে ভয় করেনি। সাহস করে রহমান নামে একটা ছেলে ওকে পপিন্সের চাকি দিয়েছিল। বসুমতী ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তবু ওরা বিরূপ হয়নি। উত্যক্ত করেনি। উত্যক্ত করে অন্য বয়সের পুরুষ অন্য সময় ভিন্ন উদ্দেশ্যে। মহিলারা নাক সিটকায়। তবু একবার ঠিক দেখে নেয় বসুমতীর চোখ, আর ভাবে এই পেত্নীর এমন দীঘল চোখ হল কী করে। আমারো যদি এমন হত ? যতই ময়লা হোক, ওর মতো লতালতা শরীর।

ওখান থেকে তাড়া খেয়ে শিব বাড়ির টঙিতলা। টঙিতলার চারদিক খোলা। শিবের চোখের সামনেই কোনো কোনো রাতে ওকে ছারখার করে দেয় বয়স্ক মানব পশু। পাথরের শিব, কিছুই করার নেই। পেছনে পেছনে অনুসরণকারী বালক হয়তো অল্প দূরে ঘুমে অচেতন তখন। রাত গভীর।

সারাদিন ঘুরে বেড়ায় কোথায় কোথায়। হঠাৎ মনে হল কিছু, হয়তো দাঁড়াল। কেউ দিয়ে দিল এক ডিবি চাল, কোনো দোকানে দিয়ে দেয় পচনশীল আলু, পেঁয়াজ। একদিন কিংবা প্রায়দিনই, ভদ্রবাড়ির ভদ্রজন ভিক্ষা দেয় হয়তো দু টাকা। পরিবর্তে ভিখারিনীর কাছেই অন্য এক আদিম ভিক্ষা চায়। মুখ ফুটে বা হাত দিয়ে তুলতে পারে না, নিতান্ত ভদ্র বলেই। চোখ দিয়ে তুলে নেয়। দাত্রী সেসব খেয়ালও করে না।

একদিন হল মুস্কিল। ভূজঙ্গ করল এক ফ্যাসাদ। প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া পাঁঠার কাটা মুন্ডু বসুমতীকে দিয়ে বলল—'খেয়ে নিস রান্না করে।'

ভূজঙ্গের দয়া মায়ার শরীর। নারীকুলের জন্যে ওর প্রসারিত হৃদয় হয়তো কুঁই কুঁই করে। বসুমতীর শরীরে হাতটাত বুলোয়। স্তনে হাত দিতেই পুরোনো বোধ চেতন হয়তো ফিরে আসে উন্মাদিনীর। কষে চড় মারে ভূজঙ্গের গালে। ভয়ে দয়ামায়া হাওয়ায় মিলায়।

যার কোনো তৈজস নেই সে রাঁধবে পাঁঠার মুন্ডু। বসুমতী ছুঁড়ে দেয় দূরে অবহেলায়। কৃতজ্ঞতায় কুকুর তুলে নেয়, কাকের সাথে ভাগাভাগি করে খায় সংস্কৃত টোলের পেছনের খোলা মাঠে। যেখানে স্তোত্র পাঠ শেখে বিদ্যা।

সাত বছরের বালক, তার কোনো নাম নেই। কেউ রাখেনি। যে রাখবে সে রাখেনি, তো

কে আর রাখবে। কার এমন ঠেকা পড়েছে। কোনো ভাষা শেখেনি। ভাষা বলতে কুকুরের ডাক, গাড়ির কোলাহল, মানুষের মন্দিরের ঘন্টাও শঙ্খের ধ্বনি আর মানুষেরই ব্যবহৃত কিছু না মানবিক সম্বোধন ওর প্রতি—'হেই বাঞ্চোৎ, কুত্তার বাচ্চা, রেন্ডির আউলাদ'। একবার মাত্র শুনেছিল কিছু অমানবিক শব্দ। এক বৃদ্ধাকে রাস্তা পার করে দিয়েছিল বালক। বৃদ্ধা বলেছিলেন—'বেঁচে থাক বাবা।'

বসুমতীর মাঝে মাঝে মন ঠিক থাকে না। কেন যেন উতলা হয় সব স্পষ্ট বোঝে না। মনটা হারায় হয়তো তখন, যখন ও রাস্তার চৌমাথায় শীতের রাতে কয়েকজন, পোয়ালে আগুন দেয়। তখন এমন এক ঘ্রাণ ওঠে, মনে হয়, এমন গন্ধ আগে কোথায় যেন পাওয়া যেত ? অস্পষ্ট ঝাপসা ঝাপসা চোখে ভাসে—বিস্তীর্ণ ক্ষেত। ক্ষেতে ধানকাটা শেষ। ধানের গোছা স্তূপাকার নিকানো উঠোনে। শীত কাতর কেউ আগুন জ্বেলে দিয়েছে পোয়ালে। পোয়ালের পোড়া গন্ধে মিঠে সুবাস। আর কিছুই মনে পড়ে না।

তখনই আবার অস্থির হয়। একা একা হাঁটে যেদিকে দুচোখ যায়। ঘন কুয়াশার রাত তখন দ্বিপ্রহর। ঘুমিয়ে থাকলেও ঠিক টের পায় ঐ বালক। ছায়ার মতো অনুসরণ করে। ডাকে না। কোনো ডাক জানা নেই। যদিও ধ্বনি আছে গলা ও জিহ্বায়। কী ডাকবে ?

অনুসরণ করা বালককে বসুমতী বলে, হেই, ভাগ্!

বালক ভাগে না। বসুমতী আবার এগোয়। আবার বলে জোরে, ভাগ, কে তুই ?

যে কেউ নয়, সে তবু অনুসরণ করে। উত্যক্ত বসুমতী একসময় ঢিল তুলে নেয়। ছুঁড়ে মারে। বালকের বুকে ঢপ্ শব্দে আছড়ে পড়ে ঢিল। যন্ত্রণা হয়। একই ঢিল রাগের মাথায় সেও তুলে নেয়। ছুঁড়ে দেয় আপাত প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ করে। বসুমতীর কপালে খটাস শব্দে আঘাত করে ঢিল। 'উ-মাগো' বলে দুহাতে কপাল চেপে ধরে বসে পড়ে সুনসান রাস্তায়, আঙুল ভিজে যায়।

রাস্তার আলোয়, কপালের রক্ত দেখে ছুটে যায় বালক বসুমতীর দিকে। নিজেই চেপে ধরে দুহাতে নিজের রচিত ক্ষত। এদিক ওদিক তাকায় বোধহয় জল খোঁজে। এখানে জল নেই। ঢোলা খাকি শার্টের তলা দিয়ে মুছে দেয় বিন্দু বিন্দু লোহিত।

বসুমতীর পুরানো চেতন একটু একটু ফিরে আসে, আবার মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে।

পথের কুকুরের দল জড়ো হয় ওদের কাছে। কেউ ঘেউ ঘেউ করে না। দুজনকেই ওরা চেনে।

বালক তখনো মুছে দেয় প্রবাহিত রক্ত। বসুমতী ওর দিকে তাকিয়ে বলে খুব আস্তে, বেশি জোরে লেগেছে রে ? তোর ব্যথা হচ্ছে ?

বালক তাকায় ওর দিকে, ও বালকের দিকে। তারপরই ভীষণ এক অমানবিক কাজ করে ফেলে ওরা। বসুমতী দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নেয় বালককে। বালকও আঁকড়ে ধরে বসুমতীকে। আর দুজনে শান্ত জনবিরল রাজপথে হু হু কাঁদে বেশ জোরে জোরে। কুকুরের দল

মুগ্ধ হয়ে যায়। ওরা পলকহীন চেয়ে থাকে, ওদের চোখ টলটল করে।

এক কুকুর আরো এগিয়ে যায় বসুমতী ও বালকের কাছে। গন্ধ শোঁকে। হয়তো মনে পড়ে যায়—কয়েকদিন আগে এই রাস্তার বুকে, গাড়ির তলায় থেঁতলে যাওয়া নিজের ছটফটে শাবকের সতেজ স্মৃতি। পশুদের, একেবারেই নিজস্ব, মানবিক আবেগে আকাশের দিকে মুখ তুলে স-ক্রন্দন ডাক দেয়—হা-উ-উ-উ!

রাতের আকাশ ফালা-ফালা হয়ে যায়। বালক ও বসুমতী তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আর, বসুমতীর মধ্যবুকে নামহীন বালকের প্রকৃতই ঘুম পায়।

ওভার ব্রিজের তলায় শুয়ে আছে বসুমতী। চোখ লেগেছে একটু আগে। বেশ কিছুটা তফাতে শুয়েছে চতুর বালক। এখনো ভরসা পায় না—যদি আবার মারে ও ?

আজ শীত নেই। আকাশ মেঘলা। অন্ধকার খুব গাঢ়। মাথার উপর দিয়ে ছুটে যায় রাতের ট্রাক।

পাশেই রেল লাইন। ওখানে ছোটে রেল। বড় বেশি লম্বা এক মাল গাড়ি চলে গেছে এইমাত্র। দোকান খোলা। ফুটবলের ব্লাডারে ভরা চোলাই মদ পাওয়া যায়। বাকি দোকান—স্টুডিও, স্টেশনারি এখন বন্ধ।

যখন সিনেমা চলছিল, তখন চাপা হলেও গানের শব্দ প্রায় স্পষ্ট আসছিল এখানে— 'মজার মজার ভেল্কি দেখো / আজব-তাজব সার্কাস দেখো / প্যারেলালের খেলা দেখে যাও, ও বাবু!'

শুনতে ভালো লাগলেও গানটায় মজা লাগেনি। গেটকিপার ওকে কোলে নিয়ে বলছিল—'সিনেমা দেখবি ? আয়!' তারপর কী আদর হাতে-পায়ে-গলায়-গালে, যেখানে সেখানে হাত দিয়ে কচলায়। ব্যথা হয় বালকের। সিনেমা দেখেনি। গান শুনতে শুনতে ব্রিজের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

চিৎ-শোয়া বসুমতীকে চেপে ধরেছে হাত। হাতের ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে একটা দশ। বসুমতীর মুখ চেপে ধরে বাঁ-চেটোয়। পাশে খুলে রেখেছে খাকি টুপি। কোমরের বেল্ট খুলে নেয়। শরীরের চাপে নীচের শরীরকে বিবস্ত্র করতে চায়। প্রাণপণে বাধা দেয় বসুমতী। —ছাড়, ছাড়! সব খুলে নেয় টেনে হিঁচড়ে। মেয়েলী শরীর বেআব্রু। কতবার যে এমন হল! এখন আবরণ বলতে উপরে এক পুরুষ শরীর। দুমড়ে-মুচড়ে শেষ করতে চায় বসুমতীকে। বালক বেশ সবল বয়সের তুলনায়। যে পাথরে শিয়র রেখে ঘুমিয়েছিল, এটাই তুলে নিল দুহাতে।

যত জোর আছে, সব জোর একত্রিত করে আঘাত করে হামলে পড়া ওর মাথায়। হাড় ও পাথরে খটখটি শব্দ হয়। মারে পর পর তিনবার। ফলে মাথার পিছনে দুই ফাঁক। ঐ ফাঁকে গলগলে ঘিলু ও রক্ত গড়ায়।

প্রায় নিষ্প্রাণ ভারী দেহকে সরিয়ে মুক্ত হয় এইবার অক্ষত বসুমতী। আর এভাবেই, জন্মদায়িনীর স্তন্যদুগ্ধের কিছুটা ঋণ পরিশোধ করে দেয় এই 'বরাহ শাবক।'

কাপড় গুছিয়ে বসুমতী ত্রস্তে বলে, চল পালাই—!

অন্ধকারে পথ নেই। তবু হয়ে যায়। যে পথে প্রাণী পালায়, সেই চিহ্ন ধরে আপৎকালীন পথ নিজেই তৈরি হয়ে যায়। এমনই পরিসর ধরে দুজনে পালায়। জন্মদায়িনী ও জাতক জানে না এখন, কোথায় পালাবে ? কোন দেশ, কোন মাটি, কোন হাওয়া, কোন জল ওদের, ওরা একদম জানে না। পৃথিবীর আকারটাও বড় বিশ্রী। হোল। ছুটতে ছুটতে আবার তো এখানেই ফিরে আসতে হবে। গোক। ছুটতে ছুটতে আরো কিছুটা অবকাশ তো পাওয়া যায় বেঁচে থাকার। এ প্রত্যাশাই মানুষকে ছোটায়। ওরা ক্রমাগত পালায়। রেল লাইন টপকে, রেলের পাশে সিগন্যালের তারে হোঁচট খেয়ে বসুমতী বালক সহ সাবধানে পালায়।

ব্রিজের তলায় পড়ে থাকে রাতের প্রহরা থেকে বিচ্যুত 'বরাহের' চেয়ে নিকৃষ্ট দু'পেয়ে এক মধ্যবয়স্ক প্রাণীর সদ্য লাশ। পাশে ঘিলু ও রক্তে ভেজা টুপি।

দূরে, হুইসেল দেয় স্টিম ইঞ্জিন। আলোর তীব্র ঝলক ফেলে ছুটে যায় একা একা কোথায় কে জানে। আলো ঠিকরানো সমান্তরাল লোহার লাইন চকচক করে। ইঞ্জিনের তলপেট থেকে অসময়ের গর্ভপাতের মতন ঝরে যায় এক কাঁই পোড়া জ্বলন্ত কয়লা আর ঊর্ধ্বমুখী একমাত্র নলাকার নাক থেকে শ্রান্তিতে বেরোয় কালো ধোঁয়া। বাতাস ভার হয়ে আসে অঙ্গারের দহনে। কিংবা এমন হয়—জ্বলন্ত চিতা নিয়ে ছুটে যায় স্টিফেনশনের স্টিম শকট। লাইনের পাশে পড়ে থাকা প্রহরীর মৃতদেহ এত তীব্র আলোয়ও নজর এড়ায়। সময় নেই। ওর নিজেরও ছুটে যাওয়া আছে। ছুটন্ত বালক ও বসুমতীর চুল হাওয়ায় ওড়ে। তবু ওরা পালায়। বাষ্পীয় শকটের মতো ওদের অভ্যন্তরে জ্বলন্ত চিতা নেই, তবু দহন আছে। দুজনের কেউ কিচ্ছু বলে না। শুধু ক্লান্ত শ্বাস ফেলে খুব দ্রুত। আর আকাশের নক্ষত্রেরাই সায় দেয়—তোমরা পালাও পালাও। সব দেশ, সব লোকালয় ছেড়ে যতদূর পারো পালাও। মানুষের পরিচয় যেখানে মানুষ নয়, সেই কুটিল অরণ্য ছেড়ে পালাও। আমরা তোমাদের আলো দেব। পথ দেব। সব দেব। নক্ষত্রেরা বলে দেয় অকপট সাবধানে—পালাও পালাও, ও বসুমতী! তোমার উদরে আরো এক স্তন্যপায়ীর সৃজন হয়েছে কিছুদিন আগে—অনেক আলোক বর্ষের দূরত্বে থেকেও আমরা পরিষ্কার দেখি সব, তোমাদের সব!

কোনদিন, কখন এবং সঠিক কার ঔরসে প্রাণময় লালচে গোলাপি মাংসপিন্ড তিল তিল করে ক্রমবর্দ্ধমান এইসব স্পষ্ট বোঝে না বসুমতী। ওরা ছোটে আর পালায়। রমণীর সহজাত বোধও সাবধান করে বসুমতীকে, সাবধানে পালা। তোর পা ভারী আছে।

সেই ফেলে আসা দূর—বহুদূর চেতনে ফিরে যায়, আবার ফিরে আসে, এভাবে বার বার।

ধানে বোঝাই মসৃণ করে লেপন দেওয়া নিকানো উঠোনের কোণায়, ঠান্ডা শীতের রাতে জ্বলে ওঠা নাতিদীর্ঘ আগুনশিখা আর পোঁড়া পোয়ালের সেই ঘ্রাণ নাকে লাগে।

বসুমতীর সাবেক চেতনা ফিরে আসে, আবার মিলিয়ে যায়। আর এভাবেই ভাসা ভাসা অবচেতনায় ছুটন্ত বালকের হাত ধরে তাড়া দেয় বসুমতী। রাতুল, জোরে ছোট্‌রে বাবা!

—:: **সমাপ্ত** ::—

শেখর দাশের সংক্ষিপ্ত জীবন ও সাহিত্য

শেখর দাশের জন্ম ২১শে মে ১৯৫২ সালে লক্ষ্মৌ শহরে। শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে পুনে, কাটিহার, মার্ঘেরিটা ও রাঁচিসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে। বর্তমানে আসামের শিলচর শহরের বাসিন্দা। পেশা সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। বর্তমানে অবসরে। ১৯৭৩ সাল থেকে লেখালেখি শুরু। 'কোষাগার' তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। ১৯৯৯ সালে বেরোয় প্রথম উপন্যাস 'মোহনা'। প্রায় তিরিশটি ছোটগল্প চারটি অনুগল্প একটি ই-বুক কাব্য সংকলন 'সব তুচ্ছ লাগে' এবং আটটি উপন্যাসের তিনি সফল রচয়িতা। প্রখর বাস্তববাদী, যন্ত্রণা ক্ষোভ ও ভালোবাসাকে চিত্রিত করতে তিনি সিদ্ধ। বর্তমান উপন্যাসে লেখক দেশভাগ দাঙ্গায়, অসহায় স্বজনহারা ছিন্নমূল মানুষের বেঁচে থাকার যে ছবি এঁকেছেন তা বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রা যোজনা করেছে। 'বিন্দু বিন্দু জল' শেখর দাশের সেরা উপন্যাস। তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মূল কণ্ঠস্বর তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে আমাদের নিকট একজন প্রিয় লেখকের আসনে আসীন। মানুষের ভালোবাসাই তাঁর নিকট পরমপ্রাপ্তি এবং একমাত্র পুরস্কার।

উপন্যাস :

মোহনা, বিন্দু বিন্দু জল, বনজারা, রাঙামাটি (অপ্রকাশিত), দ্রাঘ্রিমা, রেগিস্তান, কালাপানি, নীলকণ্ঠ (অসমাপ্ত-চলছে)।

গল্প :

ক্রমশ: তাপ, শ্বেতরক্ত কণা, খেলাঘর, তদন্ত, আসন্ন বিকেলের শেষে, অদূরে সৈকত, ফেরারি, জোড় শালিক, শব্দের প্রতিচ্ছবি, ডায়নোসরের ফুসফুস, জনসভা, আপৎকালীন, মৃতবৎসা, অপ্সরা, গগনের মাটি, জননী, লস্ট হোরাইজন, পরিব্রজন, আজান, রাতের ট্রেন, ভিক্ষুক, এক সমাপনহীন মহড়া, খেয়া, কোষাগার, তস্কর, অন্নজান, ... ইত্যাদি।

অনুগল্প :

পিণ্ডদান, দস্তাবেজ, গেষ্ট-হাউস, সাঁঝা চুলা।

ই-বুক কাব্য :

সব তুচ্ছ লাগে,

তাঁর কবিতা গল্প উত্তর পূর্বাঞ্চলের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তিনি ২০১৭ সালে অসম সাহিত্য সভার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ পুরস্কার পান। বর্তমানে শেখর দাশ দীর্ঘ বিরতির পর নিয়মিত লেখালেখিতে ব্যাপ্ত। —গোবিন্দ ধর